সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ষট্‌ত্রিংশ ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কলিকাতা
২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ মন্দির
হইতে শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩৬

ষট্‌ত্রিংশ ভাগের সূচীপত্র

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

[ষট্‌ত্রিংশ ভাগ]

সভাপতির অভিভাষণ

বাঙ্গালার বৌদ্ধ সমাজ

হিন্দু ও বৌদ্ধ

বাঙ্গালা দেশে কিরূপে হিন্দুধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মকে গিলিয়া ফেলিয়াছে, সেই কথাটা আজ কিছু বলিব। যখন আফগানেরা বাঙ্গালা দখল করেন, তখন পূর্ব্বভারতের অধিকাংশ লোক বৌদ্ধ ছিল। তাহার পূর্ব্বে পাঁচ শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরাই বাঙ্গালা ও বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেনেরা ইহার মধ্যে এক শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালার একাংশে রাজা ছিলেন মাত্র। পালেরা বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহারা যে শুদ্ধ বাঙ্গালা ও বিহারে রাজত্ব করিতেন, এমন নহে, এ দুয়ের বাহিরে অনেক দেশে তাঁহাদের অধিকার ছিল। এক শত বৎসর ধরিয়া তাঁহারা পেশোয়ার হইতে গোদাবরীর মুখ পর্য্যন্ত আপনাদের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ও মগধের বৌদ্ধ সাহিত্য, বৌদ্ধ ব্যাকরণ, বৌদ্ধ কোষ, বৌদ্ধ শাস্ত্র, বৌদ্ধ দর্শন, বৌদ্ধ শিল্প ও বৌদ্ধ সভ্যতা সমস্ত উত্তর ভারতবর্ষ ছাইয়া গিয়াছিল।

ইংরাজী ৭৩২ অব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বাঙ্গালায় শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি বাঙ্গালায় বৈদিক ধর্ম্ম ও বৈদিক সভ্যতা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কুমারিলের প্রভাবে তাঁহারা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলেন এবং আসিয়া অবধি তাঁহার প্রভাব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কয় জন ছিলেন? বল্লাল সেন তাঁহাদের সংখ্যা করিয়াছিলেন, দেখিয়াছিলেন,—৩৫০ ঘর রাঢ়ী ও ৪৫০ ঘর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ মাত্র বাঙ্গালায় ছিলেন। তাহার উপর আর ৭০০ ঘর সাতশতী, আর ৫০০ ঘর বিদেশীয় ব্রাহ্মণ ধরিলেও ২০০০ ঘরের বেশী ব্রাহ্মণ এ দেশে ছিলেন না। ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে বাঙ্গালায় ২৫টা জেলা হিন্দু করা যায় না, উহার দশ ভাগের এক ভাগও হিন্দু করা যায় না। সুতরাং এ অঞ্চলে অধিকাংশ বৌদ্ধ ও সামান্য অংশ হিন্দু ছিলেন।

কেমন করিয়া এই ২০০০ ঘর ব্রাহ্মণে এই বিশাল দেশকে ৭০০ বৎসরের মধ্যে হিন্দু করিয়া তুলিয়াছেন, বৌদ্ধের নাম পর্য্যন্ত লোপ করিয়া দিয়াছেন, তাহা একটা মহা সমস্যা, একটা বিরাট ব্যাপার, একটা রহস্যময় ঘটনা। বাঙ্গালা দেশ যে বৌদ্ধময় হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখন রিসার্চ্চ করিয়া বাহির করিতে হয়। প্রথম ত বিশ্বাসই হয় না, তাহার পর ঘাড় পাতিয়া লইতে হয়। একবার ঘাড় পাতিয়া লইলে চক্ষু ফুটে—তখন বাঙ্গালার অনেক রহস্য জলের মত

বুঝিতে পারা যায়, বৌদ্ধদেব অমিত শক্তি অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের অমিত শক্তি, অমিত ধৈর্য্য ও অমিত পরাক্রম স্মরণ করিয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়।

বাঙ্গালায় যদি কোন ইতিহাসের গূঢ় কথা থাকে, যদি কোন নিগূঢ় কথা থাকে, তবে তাহা এই। রহস্য-জাল ভেদ করিয়া এই কথাটী খুলিয়া দিলে বাঙ্গালীর চক্ষু স্পষ্ট দেখিতে পায়—তাহারা কি ছিল, কি হইয়াছে ও ভবিষ্যতে কি হইতে পারে। অতীতে তাহাদের অগৌরবের কিছুই নাই, সবই গৌরবময়। ভবিষ্যতের গৌরব অগৌরবের কথা তাহাদের নিজের হাতে।

ছেলেবেলা গল্প শুনিতাম, যদি একটী কাঁচপোকা ও একটী আরশুল্লাকে একটা শিশি বা বোতলের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে কিছু দিন পরে দেখিতে পাওয়া যাইবে, আরশুল্লাটা কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে, দুইটাই কাঁচপোকা হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ইতর-বিশেষ করা যায় না। মুসলমান অধিকাররূপ শিশিতে বা বোতলে হিন্দু ও বৌদ্ধ দুই জাতিকে বন্ধ রাখিয়া এই সাত শত বছরের পর দেখা যাইতেছে, দুই-ই এক হইয়া গিয়াছে, ইতর-বিশেষ করা যায় না। আবার ইংরাজ অধিকাররূপ বোতলে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি বন্ধ হইয়া থাকিলে, কয়েক শত বৎসর পরে তাহারা যে এক হইয়া যাইবে না, ইহা কে বলিতে পারে? এখনই ত অনেকে বলেন যে, এই যে মুসলমান জাতি এখন বাঙ্গালা দেশে অর্দ্ধেকের উপর বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন, ইঁহারা সেই বিশাল বৌদ্ধসমাজের একদেশ মাত্র। অর্থাৎ বাঙ্গালায় হিন্দু ও মুসলমান একজাতি মাত্র।

বৌদ্ধ কাহাকে বলে?

হিন্দু ও বৌদ্ধ, এই দুই জাতি লইয়া যখন বাঙ্গালা দেশ, তখন হিন্দু কাহাকে বলে ও বৌদ্ধ কাহাকে বলে, এটা ঠিক করিয়া লওয়া বড় দরকার। লোকে বলিবে, এ ত সহজ কথা, এর আবার ঠিক করা কি? সহজ কথাই বোঝা যায় না। সকলেই মনে জানে, আমি ঠিক বুঝি, কিন্তু জেরায় টিকে না। অনেক পণ্ডিত আছেন, তাঁহারা মনে করেন যে, বৌদ্ধ বলিতে শুদ্ধ ভিক্ষুসমাজ বুঝায়, কেন না, বুদ্ধদেব নিজে ভিক্ষুসমাজ লইয়াই থাকিতেন। তাঁহার বিনয় ভিক্ষুদের জন্য, তাঁহার যত কিছু আইন-কানুন, পাচিত্তিয় পারাজিকা ভিক্ষুদের জন্য। সুতরাং বৌদ্ধ বলিতে গেলে ভিক্ষুসম্প্রদায় ছাড়া আর কিছু বুঝায় না।

আর এক দল বলেন,—না। গৃহস্থ বৌদ্ধও ছিল, যাহারা ব্রাহ্মণ মানিত না। ভিক্ষুদের কাছে ধর্ম্ম ও নীতি উপদেশ লইত। ভিক্ষুদের খাওয়াইত, আদর করিত, ভিক্ষুদের জন্য বিহার, সঙ্ঘারাম তৈয়ার করিয়া দিত, ভিক্ষুদের ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিত, তাহাদের অন্তর্ব্বাস বহির্ব্বাস জোগাইত, তাহারাই গৃহস্থ বৌদ্ধ। ভিক্ষুরা ত রোজগার করিত না, ভিক্ষা করিয়া খাইত। যাহারা তাহাদের ভিক্ষা দিত, তাহারাই গৃহস্থ বৌদ্ধ। একজন ভিক্ষু তিন বাড়ীর অধিক চারি বাড়ীতে ভিক্ষা লইতে পারিত না। যে বাড়ীতে একবার ভিক্ষা পাইয়াছে, এক মাসের মধ্যে আর সে বাড়ীতে যাইতে পারিত না। সুতরাং একজন ভিক্ষুর জন্য ৯০ ঘর গৃহস্থ বৌদ্ধের দরকার হইত। ইহার উত্তরে এই কথা বলা যায় যে, হিন্দুরাও ত ভিক্ষা দিত, তাহারাও ভিখারী ফিরাইত না। সুতরাং গৃহস্থ বৌদ্ধ না থাকিলেও গৃহস্থ হিন্দুর দ্বারাই ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণ হইতে পারিত।

আর এক দল বলেন যে, না। বুদ্ধদেব ভিক্ষুর জন্য দশ শীল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু ধার্ম্মিক গৃহস্থের জন্য অষ্ট শীল, আর অপরাপর গৃহস্থের জন্য পঞ্চ শীল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সুতরাং গৃহস্থ বৌদ্ধ অনেক ছিল। বৌদ্ধ-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য—সংসার ত্যাগ বা ভিক্ষু হওয়া। সুতরাং যে গৃহস্থ সেই উদ্দেশ্যের দিকে যত অগ্রসর হইতে থাকিবে, তাহার তত সম্মান ও আদর হইবে। তাহা হইলেও পঞ্চ শীল লইবার জন্য যে শিক্ষা দীক্ষা প্রয়োজন হইত, তাহাই বা ক'জনের ছিল? অথচ শুনিতে পাওয়া যায়, গ্রামকে গ্রাম, নগরকে নগর, দেশকে দেশ বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা কিরূপে হইতে পারে?

অতএব সব বৌদ্ধকে ভুক্ত করিয়া লইতে পারে, এমন একটা বৌদ্ধের লক্ষণের দরকার হইল। সে লক্ষণ দেখা দিল এগার শতকে। তিন জন গুপ্ত একখানি বই লিখিয়া বইখানির নাম দিলেন,—আদিকর্ম্মরচনা। তাঁহারা বলিলেন, যে কেহ প্রাতঃকালে উঠিয়া বলিবেন,—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি ও সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি, তিনিই বৌদ্ধ। অনেক দিন ধরিয়া এই তিনটী মন্ত্র শিখাইবার জন্য পুরোহিত দরকার হইত না, কিন্তু পরে হইয়াছিল। সুতরাং যাহার জন্য পুরোহিত দরকার হইত না, উপাসক নিজেই ইচ্ছা করিলে মন্ত্র লইতে পারিতেন, তাহার দ্বারা যে, ধর্ম্মের শিষ্যসংখ্যা বৃদ্ধি হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আপামর সাধারণ আপনি আপনি এই তিনটি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেই বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য হইতেন। বৌদ্ধের সংখ্যা বাড়িয়া যাইত।

কিন্তু 'শীল' দিবার সময় বড় গোল বাধিত। যাহারা মাছ ধরিয়া খায়, মাছ ধরা, শীকার করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়, চুরি করা যাহাদের জাতীয় ব্যবসায়, তাহারা শীল লইতে পারিত না। বৌদ্ধধর্ম্মে তাহাদের ধর্ম্ম বিষয়ে উন্নতি লাভের আশা থাকিত না। তবে তাহারা জাতীয় ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া, হালিকাদি ব্যবসায় আরম্ভ করিলে, তাহাদিগকে শীল দিবার কোনও আপত্তি থাকিত না। যাহারা জাতীয় ব্যবসায় ছাড়িত না, তাহারা হয় বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বনিম্ন স্তরে পড়িয়া থাকিত, অথবা তাহাদের জন্য ধর্ম্মান্তরের ব্যবস্থা হইয়াছিল। যথা—কৌলধর্ম্ম, মৎস্যেন্দ্রনাথের ধর্ম্ম, মীননাথের ধর্ম্ম, গোরক্ষনাথের ধর্ম্ম ইত্যাদি।

একবার বৌদ্ধ হইলে, সে পঞ্চ শীল লইতে পারিত, অষ্ট শীল লইতে পারিত, দশ শীল লইয়া ভিক্ষু হইতে পারিত, ভিক্ষু হইলে ক্রমে উন্নতি করিয়া স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ এবং পরে বোধিসত্ত্ব হইয়া বুদ্ধ বা জগদ্গুরু হইতে পারিত। কিন্তু সে সকল জন্মজন্মান্তরসাধ্য।

হিন্দু কাহাকে বলে?

যাঁহারা মনে করেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন দেবতার পূজা হয় না, ধর্ম্ম উপদেশ পাওয়া যায় না, তাঁহারাই হিন্দু। হিন্দুরা জাতিভেদ মানেন। এক জাতিতে জন্মিলে এ জন্মে আর উচ্চ জাতিতে যাওয়া যায় না, যাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাস, তাঁহারাই হিন্দু। যাঁহারা দেবতা মানেন, কিন্তু দেবতা হইতে চান না, তাঁহারাই হিন্দু। ব্রাহ্মণ হিন্দুদের মধ্যে সকলের উঁচু। ধর্ম্ম ও নীতি তাঁহাদেরই হাতে। ক্ষত্রিয়েরা দেশ শাসন করেন। বৈশ্যেরা কৃষি, পশু-পালন ও বাণিজ্য করেন। শূদ্রেরা উপরের তিন জাতির সেবা করেন। বাঙ্গালায় কিন্তু ব্রাহ্মণ আর শূদ্র ভিন্ন জাতি নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে অর্থাৎ তাঁহারা বৌদ্ধ হইয়া জাতিভেদের হাত এড়াইয়াছেন।

ব্রাহ্মণের সকল বইই সংস্কৃত ভাষায় লেখা। সংস্কৃত ব্রাহ্মণ ভিন্ন কেহ পড়িতে পারিবে না। যাঁহারা হিন্দু হইয়া শূদ্র-শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা সংস্কৃত শিখিতে পারিবেন না। কিন্তু বৌদ্ধেরা—বিশেষ বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সংস্কৃত পড়িতেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের সংস্কৃত পড়া বন্ধ করিতে পারেন নাই। অনেক সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লেখা বই তাঁহাদিগকে পড়িতে হইত ও পড়াইতে হইত, তাহা তাঁহারা অম্লানবদনে করিতেন। কিন্তু তাঁহারা বৌদ্ধদের সংস্কৃতকে অশুদ্ধ বলিতেন ও তাহা পড়িয়া নাক সিঁটকাইতেন। বৌদ্ধেরা বলিতেন, আমরা সুশব্দবাদী নহি সত্য, কিন্তু আমরা যাহা বলি, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত ও সত্য। বৌদ্ধেরা অন্য ভাষায়ও বই লিখিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃত ছাড়া প্রধানতঃ অন্য ভাষায় বই লিখিতেন না।

ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-দলভুক্ত লোকদিগের সহিত আহার ব্যবহারাদি সামাজিক সম্বন্ধ রাখিতেন। এবং নিতান্ত নীচধর্ম্মী ও নীচকর্ম্মী লোক ভিন্ন আর কাহাকেও অস্পৃশ্য বলিতেন না। কিন্তু তাঁহাদের মতে হিন্দু ভিন্ন আর সকল জাতিই অনাচরণীয় ছিল। অর্থাৎ যুদ্ধের সময় যেমন শত্রুপক্ষকে বড় এবং ছোট সকল প্রকার সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করা হয়, তেমনি হিন্দুরা বিধর্ম্মীদিগকে অনাচরণীয় মনে করেন। তাঁহাদের মতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ বলাইলেও তাহারা অনাচরণীয়। কারণ, তাহারা বিদেশী ও বিধর্ম্মী। মুসলমানেরা অনাচরণীয়, যে হেতু তাহারা বিধর্ম্মী। বৌদ্ধেরাও অনাচরণীয়। এই সকল অনাচরণীয় জাতির অনেকে এখন ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। ব্রাহ্মণেরা সেই সকল ব্রাহ্মণকে পতিত ও অনাচরণীয় মনে করেন।

পূর্ব্বকালে যখন বৌদ্ধেরা প্রবল ছিলেন, তাঁহারাও হিন্দুদিগকে অনাচরণীয় মনে করিতেন। এ সম্বন্ধে 'চতুঃশতিকা' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের টীকায় চন্দ্রকীর্ত্তি একটি গল্প দিয়াছেন,—একটি যুবক সর্ব্বদা এক বৌদ্ধ বিহারে যাতায়াত করিত এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুদের খুব সম্মান করিত। ভিক্ষুরা তাহাকে দীক্ষা দিবার জন্য বড়ই আগ্রহ করিতেন। সে দীক্ষা লইত না, বলিত,—এখনও দেরী আছে। তিন চারি মাস পরে সে একদিন আসিয়া বলিল, আমার দীক্ষা লইবার সময় হইয়াছে। ভিক্ষুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, এত দিন হয় নাই, এখন হইয়াছে কেন? সে বলিল, এখন আমার ব্রাহ্মণ দেখিলেই মনে হয়, ইহাকে এক কোপে কাটিয়া ফেলি, সুতরাং আমার বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের ঠিক সময় হইয়াছে। সুতরাং অস্পৃশ্য ও অনাচরণীয় করার জন্য এখন যে ব্রাহ্মণদিগকেই দোষী করা হয়, সেটা ঠিক নয়। সকল ধর্ম্মের লোকই বিরুদ্ধ ধর্ম্মের লোককে অনাচরণীয় করিয়া থাকে। অনেক জায়গায় একেবারে তাহাদের বিনাশ সাধনও করিয়া থাকে।

যাহারা সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, হিন্দুরা তাহাদের খুব সম্মান করেন। কিন্তু যদি সে আবার সংসারে আসিতে চায় অথবা আসে, তাহাকে তাঁহারা মনে করেন—পতিত ও অনাচরণীয়। অনেক জাতীয় যোগী এইরূপে হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণের চক্ষে অনাচরণীয় হইয়া আছে। যাহারা সংসার ছাড়িয়া গেল, তাহারা চতুর্ব্বর্ণ সমাজও ছাড়িয়া গেল। আবার ফিরিয়া আসিলে তাহারা চতুর্ব্বর্ণ সমাজের বাহির অর্থাৎ অনাচরণীয় হইয়া রহিল।

বৌদ্ধসাহিত্য

যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের খুব প্রাদুর্ভাব, তখন তাঁহারা সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা প্রথম চলিত ভাষায় বই লিখিতেন। প্রবল প্রতাপের সময় তাঁহারা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে

তর্কবিতর্ক কবিবাব জন্য চলিত ভাষা ছাড়িযা সংস্কৃতে বই লিখিতেন। প্রথম প্রথম তাঁহাবা ব্রাহ্মণেব ব্যাকবণ পাণিনি লয়েন নাই। অন্য নানা ব্যাকবণেব সাহায্যে বই লিখিতেন। পবে তাঁহাবা নিজেদেব জন্য সংস্কৃত ব্যাকবণ লিখিতে আবম্ভ কবেন, এবং এইরূপ ব্যাকবণ কয়েকখানা খুব চলিযাও যায়। তাহাব পব তাঁহাবা পাণিনিব টীকা লিখিতে আবম্ভ কবেন। এই টীকায় তাঁহাবা পতঞ্জলিব মহাভাষ্যকে এক হিসাবে ছাঁটিয়া ফেলিতে চান। তাঁহাদেব পাণিনিব টীকা বাঙ্গালায় খুব চলিযা যায়।

কোষে তাঁহাদেব অসীম প্রভুত্ব। তাঁহাদেব অমবকোষ সকলকেই লইতে হইয়াছিল। অমবকোষেব যত পবিশিষ্ট আছে, প্রায় সবই তাঁহাদেব। আবও অনেক কোষ তাঁহাদেব লেখা। কোষেব তিন অঙ্গ—পর্য্যায়, অনেকার্থ ও লিঙ্গ। তিন বিষয়েই তাঁহাদেব অনেক বই আছে। ব্রাহ্মণেবাও সেই সকল বই পড়েন, পডান ও তাহাদেব টীকা লিখেন।

ছন্দেও তাঁহাদেব ভাল ভাল বই আছে। তাঁহাবা পিঙ্গল নাগেব অনুসবণ কবিযা অনেক ছন্দেব বই লিখিয়া গিয়াছেন।

কেহ কেহ বলেন, ভামহ বৌদ্ধ ছিলেন। তাহা হইলে অলঙ্কাবে তাঁহাদেব প্রভুত্ব খুবই বলিতে হইবে। কাবণ, ভামহ অতি প্রাচীন। তাঁহাবই বই অনেকে অলঙ্কাবেব চলিত বইএব মধ্যে প্রথম বলিযা মনে কবেন। কাশ্মীবে ব্রাহ্মণেবা কিন্তু অলঙ্কাবে সকলকে ছাড়াইয়া উঠিযাছিলেন।

বানানেব বই বৌদ্ধদেব ঢেব বেশী। আমাব বোধ হয়, বাঙ্গালী বৌদ্ধেবাই বেশী বেশী বানানেব বই লিখেন এবং তাহাদেব প্রভাব এখনও চলিতেছে। কাবণ, বাঙ্গালীব সংস্কৃত উচ্চাবণ অন্য দেশেব সংস্কৃত উচ্চাবণ হইতে অনেক তফাৎ। তাই এইখানেই বানানেব বইএব বেশী দবকাব হয়।

এ ত গেল শব্দশাস্ত্রেব কথা। দর্শনেও বৌদ্ধদেব প্রভাব ঢেব বেশী। তাঁহাদেব দর্শন সমস্ত এসিযা এখনও পডিতেছে, পডাইতেছে ও তাহাব টীকা টিপ্পনী লিখিতেছে। তাঁহাদেব তর্ক-শাস্ত্রেবও সেইরূপ এসিয়ায় সর্ব্বত্র আদব। এখনও জাপানে বৌদ্ধমন্দিবে বৌদ্ধতর্কশাস্ত্র পডা হয়, এবং ইউনিভার্সিটিতে ইউবোপীয় লজিক পড়ান হয়। এই দুই দলে সময়ে সময়ে তর্ক বাধে, কিন্তু ভারতীয় বৌদ্ধতর্কশাস্ত্রেবই প্রায় জয়লাভ হইয়া থাকে, এবং শিক্ষিত লোকে এই বাদানুবাদেব খুব উৎসাহ দিয়া থাকেন।

বৌদ্ধদের গল্পেব বইগুলি অতি চমৎকাব। পালি ভাষাব কথা আমায় এখানে বলাব কোন দরকাব নাই। সংস্কৃতে বৌদ্ধদেব দুই জাতীয় গল্প আছে,—১। জাতক, ২। অবদান। জাতক বুদ্ধদেবেব পূর্ব্বজন্মেব কথা, আব অবদান বুদ্ধদেব ও তাঁহাব চেলাদেব পূর্ব্বজন্মেব কথা। সকল দেশেব গল্পই একটা কাঠামতে গাঁথা থাকে। আবব্য উপন্যাসেব একরূপ কাঠাম, কথাসবিৎ-সাগবেব আর একরূপ কাঠাম। বৌদ্ধদেব কাঠাম নাই, সব গল্পগুলিই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। বৌদ্ধদেব গল্পে পশুপক্ষী ও ইতব জন্তুব কথাও আছে। কথাসবিৎসাগব ও আবব্য উপন্যাসে তাহা নাই। ববং আমাদেব হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বেতালপঁচীশী ও বত্রিশ সিংহাসনে জন্তু জানোয়ারেব কথা অনেক। সেগুলিবও একটা কাঠাম আছে। খুব আঁট কাঠাম নহে, বড় আল্‌গা। বৌদ্ধদেব কাঠামই নাই।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক যদি কাব্য বা নাটক লিখিতে বসেন, জিনিষটা একঘেয়ে হইয়া যায়। বৌদ্ধদের কাব্য নাটক যে এরূপ একঘেয়ে নয়, সে কথা বলা যায় না। তবে তাহাতে কল্পনার খুব দৌড় আছে এবং সৌন্দর্য্যও খুব সৃষ্টি হইযাছে। অন্য সম্প্রদায়ের লোকও তাহা পড়িলে তাহার মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদগুণে মুগ্ধ হইয়া যায়। ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদের কাব্য নাটক পড়িতেন, তাহাতে মনোনিবেশ করিতেন এবং ব্যাকরণশুদ্ধ বলিয়া অনেক সময় উদ্ধারও করিতেন।

বুদ্ধদেবের নিজের বচন বলিয়া যে সকল বই আছে, বৌদ্ধেরা তাহারই অধিক দোহাই দেন। সেগুলি বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষের উক্তি—অনেক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লেখা এবং তাহার সংস্কৃতও বিভিন্ন রকমের। প্রজ্ঞাপারমিতার ভাব এক, ভাষা এক, উপদেশ এক এবং ধর্ম্ম এক। আর চণ্ডমহারোষণ তন্ত্রের ভাব আর এক, ভাষা আর এক, উপদেশ আর এক, আর ধর্ম্মও আর এক। দুইই কিন্তু বুদ্ধবচন।

বৌদ্ধদের এমন কোন স্মৃতির পুস্তক ছিল না, যাহাতে উপাসক ও সঙ্ঘ, দুইএরই কাজ চলিতে পারে। তাঁহাদের বিনয় শুদ্ধ সঙ্ঘের জন্য। দশ ও এগার শতকে তাঁহারা স্মৃতির বই লিখিতে আরম্ভ করেন। তাহাতে অবৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, বৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া, মন্দির নির্ম্মাণ, মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা, নিত্য কর্ম্ম, দিনের কাজ প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

বুদ্ধবচনে তন্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু সে শেষের দিকের বুদ্ধবচনে। ইহাতে মূলমন্ত্র, মন্ত্রোদ্ধার, মন্ত্রসাধনা, দেবতা-মূর্ত্তি প্রভৃতির অনেক কথা লেখা আছে। ইহা হইতেই বৌদ্ধদের দেবমূর্ত্তি সমূহের উৎপত্তির ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

এ সাহিত্য গেল কোথায় ?

এ বৌদ্ধ-সাহিত্য গেল কোথায় ? এ জিজ্ঞাসার এক উত্তর,—হয় হিন্দুরা তাড়াইয়া দিয়াছে, নয় গ্রাস করিয়াছে। কেমন করিয়া গ্রাস করিয়াছে বা গিলিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কতক কতক আভাস এখন দিব, ও তাহার পর কেমন করিয়া প্রকাণ্ড বৌদ্ধসমাজটা গ্রাস করিয়াছে বা গিলিয়াছে, তাহারও কতক কতক আভাস দিব।

বৌদ্ধব্যাকরণ গেল কোথায় ?

গোড়ায় ব্যাকরণ ধরিয়াছি। ব্যাকরণ গ্রাসের কথাটাই আগে বলি। আমরা জানি, পাণিনিই সংস্কৃতের ব্যাকরণ। ইহার সঙ্গে কাত্যায়নের বার্ত্তিক, ব্যাড়ির সংগ্রহ ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য, এই পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের ব্যাকরণ। ব্যাড়ির সংগ্রহ এখন আর পাওয়া যায় না, তাই এই ব্যাকরণশাস্ত্রকে ত্রিমুনি ব্যাকরণ বলে। কিন্তু ইহা ছাড়া সাধারণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের জন্য ছোট ছোট ব্যাকরণ ছিল এবং সে ব্যাকরণ সিদ্ধ উদাহরণ দিয়া শেখান হইত; সূত্রের সঙ্গে তাহাদের বড় একটা সম্পর্ক ছিল না। কৌমার ব্যাকরণ এইরূপ উদাহরণ দিয়া শিখান হইত। সর্ব্ববর্ম্মা সেই উদাহরণগুলি লইয়া, কতকগুলি সূত্র করিয়া কাতন্ত্র ব্যাকরণ ছয় মাসের মধ্যে সাতবাহন রাজাকে শিখাইবার জন্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে সাধারণ লোকের কার্য্য চলিত। ক্ষত্রিয়গণ, ব্যবসাদারেরা ও অন্য অন্য ভদ্রলোকের কাজ এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই চলিত। গরুড়পুরাণে ব্যাকরণের উপর যে দুটি অধ্যায় আছে, তাহা দেখিলে এ কথাটি বেশ

বুঝা যায়। বৌদ্ধেরা প্রথম যখন খাঁটি সংস্কৃতে বই লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন এইরূপ ব্যাকরণ দিয়াই কাজ চালাইতেন।

পরে তাঁহাদের নিজের একখানি ব্যাকরণ লেখা দরকার হয়। তাঁহারা যে ব্যাকরণ তৈয়ারি করেন, তাহার নাম চান্দ্র ব্যাকরণ। গ্রন্থকার চন্দ্র গোমী। তিব্বতীয় ভাষায় 'পগ্-সম্-জোন্-জঙ্' নামে যে বই আছে, তাহাতে বলে যে, চন্দ্র গোমীর বাড়ী বরেন্দ্রভূমে, তিনি থাকিতেন চন্দ্রদ্বীপে, তাঁহার সময় ৪৫০ হইতে ৫০০ ইংরাজি সন। কেন না, তিনি বলিয়াছেন, গুপ্তেরা হূণদের জয় করিয়াছে। এ স্থলে তিনি লঙ্ ব্যবহার করিয়াছেন। লঙ্ ব্যবহারের অর্থ, ঘটনাটা তাঁহারই সময়ে ঘটিয়াছিল, তিনি ইচ্ছা করিলে দেখিতে পারিতেন। হূণেরা ঐ সময়ে ভারতবর্ষে আসিয়াছিল।

চান্দ্র ব্যাকরণ—ধাতুপাঠ, লিঙ্গানুসাশন, সূত্রপাঠ, বৃত্তি প্রভৃতিতে চারি দিকে পাণিনির মত পূর্ণ ব্যাকরণ হইয়াছিল, উহার বহুসংখ্যক টীকা ছিল, সেগুলিও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত, টীকাকারেরা প্রায়ই বৌদ্ধ। এখন সে ব্যাকরণ ভারতবর্ষে একেবারে পাওয়া যায় না। সম্পূর্ণ ব্যাকরণ তিব্বতীয় তর্জ্জমায় পাওয়া যায়। প্রোফেসর বেণ্ডল নেপাল হইতে ও বিউলার সাহেব কাশ্মীর হইতে ইহার কোন কোন অংশ পাইয়াছিলেন। আমি উহার একখানি পুরা সূত্র-পাঠ পাইয়াছিলাম, সেখানি জার্ম্মানিতে ছাপা হইয়াছে। এত বড় ব্যাকরণখানা লোপ হইল কিরূপে?

সংক্ষিপ্তসার নামে একখানি ব্যাকরণ আছে, সেখানি বাঙ্গালায় রাঢ়দেশে চলে—এখনও চলিতেছে। ইহার সূত্রকার ক্রমদীশ্বর একজন শৈব ছিলেন। তিনি হিন্দুদের জন্য বই লিখেন। যেখানে যেখানে চন্দ্র ও পাণিনি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে সেখানে তিনি আপন সূত্রে বিকল্প শব্দ যোজনা করিয়াছেন। যেখানে যেখানে পাণিনি-সূত্রে, পাতঞ্জল ভাষ্য ও বৌদ্ধবৃত্তি দুই রকম মত প্রকাশ করিয়াছেন, সেখানে তিনি প্রায়ই বিকল্প বিধান করিয়াছেন। অথবা বৌদ্ধমত পরিত্যাগ করিয়া ভাষ্যের মত প্রবল করিয়াছেন। অনেকে বলেন, তিনি পাণিনির সংক্ষিপ্তসার, কিন্তু তিনি বাস্তবিক সংস্কৃত শব্দশাস্ত্রের সংক্ষিপ্তসার। চান্দ্রের প্রতি তিনি যে ব্যবহার করিয়াছেন, কাতন্ত্রের প্রতিও তিনি সেই ব্যবহার করিয়াছেন অর্থাৎ সংক্ষিপ্তসারে চান্দ্রের ও কাতন্ত্রের যাহা কিছু ভাল, সব লওয়া হইয়াছে। তাই চন্দ্র ভারতে একেবারে লোপ পাইয়াছে আর কাতন্ত্র কাশ্মীর ও পূর্ব্ববঙ্গে লুকাইয়া আছে।

চাঙ্গুদাস নামে একজন কায়স্থ বৌদ্ধ একখানি ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন, তাঁহার বইখানি লোপ পাইয়াছে। কিন্তু ব্যাকরণ বা ব্যাকরণের টীকা লিখিয়া যেমন গ্রন্থকার বা টীকাকার কারক, সমাস, তদ্ধিতের জন্য কতকগুলি কারিকা করেন, চাঙ্গুদাসও সেইরূপ কতকগুলি কারিকা করিয়াছিলেন। চাঙ্গুদাসের সেই কারিকাগুলি এখনও উড়িষ্যায় পড়া হয়। কারিকার টীকাকার একজন বৈষ্ণব। তিনি বলিয়াছেন, চাঙ্গুদাস বুদ্ধদেবকে নমস্কার করেন কেন? তিনি বলেন, গ্রন্থকারেরা প্রায়ই নিজ নিজ ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। ব্রাহ্মণেরা নিজ ইষ্টদেব বিষ্ণুকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। কায়স্থেরা নিজ ইষ্টদেব বুদ্ধকে স্মরণ করিয়া বই লেখেন। বৈশ্যেরা স্মরণ করে সূর্য্যদেবকে, শূদ্রেরা শিব ও অন্যান্য দেবতাকে স্মরণ করে। যেমন চাঙ্গুদাসের

কারিকা আছে, তেমনি বৌদ্ধ বভস নন্দীরও কতকগুলি কারিকা আছে। সেগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার ব্যাকরণও লোপ পাইয়াছে।

এই সকল হেতুতে বোধ হয়, সংক্ষিপ্তসারের প্রভাবে চান্দ্র, কাতন্ত্র, বভস, চান্দ্র লোপ পাইয়াছেন। বাঙ্গালায় চন্দ্রের যদিও বা কিছু আলোচনা হইত, প্রয়োগরত্নমালা তাহা একেবারে লোপ করিয়া দিয়াছে। এই গ্রন্থখানি কোচবিহারে তৈয়ারী হয়। কামতাপুর রাজ্য ভাঙ্গিয়া দিয়া গৌড়ের বাদশাহ আলাউদ্দীন হুসেন শাহ যখন সমস্ত কামতাপুর রাজ্য আপন রাজ্য-ভুক্ত করিতে পারিলেন না, তখন কোচ ও হাজোরা বাঙ্গালার উত্তরে এক প্রকাণ্ড রাজ্য স্থাপন করিল। সেই কোচবিহারের রাজাদের অনুরোধে পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত প্রয়োগ-রত্নমালা নামে এক ব্যাকরণ লিখিলেন খৃঃ ১৫৮০ সালে। চন্দ্রের যাহা কিছু জ্যোতি ছিল, রত্নমালার আলোতে তাহা আরও ম্লান হইয়া গেল। রত্নমালা বাঙ্গালা ও আসামের অনেক অংশে পুরাদমে চলিতেছে।

পাণিনির বৌদ্ধ টীকাগুলির খুব আদর ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়দের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভট্টোজী দীক্ষিত ও তাঁহার শিষ্যেরা সেই সকল পুস্তকে অনেক অপাণিনেয় ও ভাষ্যবিরুদ্ধ প্রয়োগ দেখিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিলেন। তাহাতে ২।৩ শত বৎসরের মধ্যে তাহাদের প্রচার এক প্রকার বন্ধ হইয়া আসিল। শেষে এমন হইল যে, পঠনপাঠন ত দূরে যাক্, তাহাদের পুথি পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। যে কষ্ট করিয়া লোকে সেই সকল টীকা সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছে, তাহা পড়িলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমার সুযোগ্য সহযোগী স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ন্যাস বা কাশিকাবিবরণপঞ্জিকার পূরা পুথি কোথাও পাইলেন না, সমস্ত ভারত ভ্রমণ করিয়া, টুকি টুকি করিয়া সংগ্রহ করিয়া, অনেক বৎসর খাটিয়া পুরা পুথিখানি ছাপাইয়াছেন। এই সকল পুথি বারেন্দ্রদেশে কিছু ছিল। তাহাতেই বারেন্দ্র রিসার্চ্চ সোসাইটীর উদ্বোধ হয়, এ সকল পুথি ছাপান উচিত। একখানি বৌদ্ধের লেখা পাণিনি-মতের ব্যাকরণ বারেন্দ্র অঞ্চলে কোথাও কোথাও চলিতেছিল, কিন্তু উহার পঠনপাঠনও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে বাঙ্গালাদেশে বৌদ্ধ ব্যাকরণকারদের নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়াছিল। যাঁহারা এই লোপের মূল, তাঁহারা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—রাঢ়দেশে বাড়ী। সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের যত টীকাকার আছেন, প্রায় সবই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ গয়ঘড় বাঁড়ুরী। ইহার উপর আবার মহারাষ্ট্রদেশের মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ মহারাষ্ট্রে স্থান না পাইয়া, গঙ্গার দু ধার আশ্রয় করিল এবং মিথিলার সুপদ্ম-ব্যাকরণ মিথিলায় স্থান না পাইয়া যশোর, খুলনা ও ২৪পরগণা আশ্রয় করিল। বৌদ্ধ ব্যাকরণগুলি লুপ্ত হইয়া গেল। মুগ্ধবোধের বহুসংখ্যক টীকাকার আছেন, এক ভরত মল্লিক ছাড়া সবই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। একজন ছাড়া সুপদ্মের টীকাকারগুলি সব বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। এইরূপে বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ ব্যাকরণগুলিকে তাহাদের শেষ আশ্রয়স্থান বাঙ্গালা হইতে লোপ করিয়া দিয়াছেন। অথচ তাহাদের যা কিছু ভাল ছিল, সব আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন।

বৌদ্ধ অভিধান

অভিধানের ব্যাপার কিন্তু আর এক রকম। সংস্কৃত অভিধান তিন জিনিষ লইয়া,— পর্য্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ। পর্য্যায় মানে, এক মানের অনেক শব্দ। নানার্থ মানে, এক শব্দের নানা অর্থ। লিঙ্গ শব্দে কোন শব্দের কোন্ লিঙ্গ। বররুচি, ব্যাড়ি, কাত্য, কালিদাস, অমর প্রভৃতি অনেকেই ইহার এক একটি অংশের বই লিখিয়া যান। কিন্তু বৌদ্ধ অমর সিংহ এই তিনটি অংশ লইয়াই 'নামলিঙ্গানুশাসন' এবং 'ত্রিকাণ্ড' নামে একখানি সরল ও সুন্দর পুস্তক লেখেন, আগেকার সব পুথি কাণা হইয়া যায়, উহার এত প্রচার হয় যে, উহার তিন চারিখানি পরিশিষ্ট লেখা হয়। একখানির নাম শেষামর, একখানির নাম 'ত্রিকাণ্ডশেষ' ও আর একখানির নাম 'বিশ্বলোচন' বা 'মুক্তাবলী'। স্বয়ং নৈষধকার উহার এক ভীষণ তীব্র, কিন্তু ছোট সমালোচনা করেন। উহার বহুসংখ্যক টীকা লেখা হয়। অমর ও তাঁহার গ্রন্থের নাম ব্রাহ্মণেরা লোপ করিতে পারেন নাই।

অমরের পর 'বিশ্বপ্রকাশ' অভিধান বৌদ্ধের লেখা, উহা কিন্তু নানার্থ শব্দ মাত্র। গ্রন্থকার আপনার অনেক পুরুষের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা সাহসাঙ্ক নরপতির চিকিৎসক ছিলেন এবং কান্যকুব্জের রাজাদেরও চিকিৎসক ছিলেন। তিনি বোধ হয়, বাঙ্গালী ছিলেন। কেন না, তাঁহার বইএ এক অংশ আছে বানানের জন্য। অভিধানে বানানের কথা এই প্রথম। বইখানি লেখা ১১১১ খ্রীঃ অব্দে।

আর একজন বৌদ্ধ অভিধানকার পুরুষোত্তম দেব, তিনি অমরের পরিশিষ্ট লিখেন। অমরের পর বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সম্প্রদায় হয়; সেই সকল সম্প্রদায় কত নূতন নূতন শব্দ চলিত করিয়া দেয়, সে সব তিনি সংগ্রহ করিয়া তাহার পরিশিষ্টে জুড়িয়া দিয়াছেন।

তাঁহার আরও একখানি অভিধান আছে, তাহার নাম 'হারাবলী'। যেখানে যত অপ্রচলিত শব্দ আছে, হারাবলীতে তাহার মানে দেওয়া আছে। তাঁহার একখানি ব্যাকরণ আছে, নাম 'ভাষাবৃত্তি'। অষ্টাধ্যায়ীর সূত্রগুলি হইতে স্বর ও বৈদিক অংশ বর্জ্জন করিয়া যাহা থাকে, তাহারই বৌদ্ধমতে ব্যাখ্যা। লোকে বলে, লক্ষ্মণসেনের আজ্ঞায় এই বই তিনি লিখিয়াছিলেন।

তাঁহার আর এক কার্য্য আছে—সেটা বানান দুরস্ত করা। অন্যান্য দেশে সংস্কৃত বানানের বইএর দরকার হয় না, কিন্তু বাঙ্গালায় আমরা অন্তঃস্থ "য" ও বর্গীয় "জ," এই উভয়ের ভেদ করিতে পারি না। অন্তঃস্থ "ব" ও বর্গীয় "ব"এর উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। মূর্দ্ধণ্য "ণ" ও দন্ত্য "ন"-কারের উচ্চারণ-ভেদ করিতে পারি না। তিনটা "শ, ষ, স"ও আমরা একই ভাবে উচ্চারণ করি। এ জন্য বানানে আমাদের অনেক গোলমাল হয়। তিনি এই সব বানানের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং যে সকল শব্দের দুই রকম বানান হইতে পারে, তাহারও একটা তালিকা করিয়া দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণেরা এই সকল গ্রন্থ লোপ করিতে পারেন নাই। নৈষধকার শ্রীহর্ষ অমরের উপর নানা দোষারোপ করিয়াও তাঁহার কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা অমরের ভাল ভাল টীকা লিখিয়াছেন. মূল হইতে টীকার আদর অধিক হইয়াছে। অমরের প্রথম বাঙ্গালী টীকা ১১৫৯ ইংরাজী অব্দে তৈয়ারী হয়—টীকাকার সর্ব্বানন্দ বাঁড়ুর্জ্যা। আমাদের দেশে

তাঁহার বইএর পুথি থাকিলেও দক্ষিণে তাঁহার অনেক পুথি পাওয়া যায় এবং সেখানে ইহার আদর অধিক। আমাদের দেশে আর একখানি টীকার আদর অধিক, সেখানি বৃহস্পতি মতিলালের। ইনি ১৪৩১ অব্দে টীকা লিখেন। তখন একজন হিন্দু বাঙ্গালার সুলতান হইয়া মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি বৃহস্পতির প্রতি বড়ই সদয় ছিলেন, ইঁহাকে অনেক উপাধি দেন। 'রায়মুকুট' উপাধি দিবার সময় ইঁহাকে হাতীর উপর চড়াইয়া অভিষেক করা হয়। ইঁহাকে অনেক জড়ওয়া গহনা দেওয়া হয়, ছটী ছত্র দেওয়া হয়, ঘোড়া দেওয়া হয়, আর রায়মুকুট উপাধি দেওয়া হয়। ইঁহাদের দুজনের টীকা ভাল করিয়া পড়িলে দেখা যায়, কেমন করিয়া বৌদ্ধসাহিত্যের লোপ হইতেছে। সর্ব্বানন্দ প্রায় ৩০ খানি বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে শব্দের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, আর রায়মুকুটে মাত্র দশখানি। ইঁহার পর বাঙ্গালায় অমরের ঢের টীকা টিপ্পনী হইয়াছে, তাহাতে বৌদ্ধসাহিত্য হইতে কিছুই উদ্ধার করা হয় নাই, বরং দেখাইতে চেষ্টা হইয়াছে যে, অমর বিষ্ণুকেই নমস্কার করিয়া তাঁহার বই লিখিয়াছেন, বুদ্ধদেবকে নহে, তিনি হিন্দু ছিলেন, বৌদ্ধ ছিলেন না। আর অমরের বইকে চাপিয়া রাখিবার জন্য অনেক নূতন নূতন অভিধান লেখা হইয়াছে। কিন্তু অমর যে অমর, সেই অমরই আছেন—তিনি মরেন নাই।

ছন্দঃশাস্ত্র

ছন্দঃশাস্ত্রে অনেকেই বই লেখেন, কিন্তু আগে সেই পিঙ্গল নাগের 'ছন্দঃসূত্র'ই চলিত। পরে বৃত্তরত্নাকর চলিতেছে। তাহার পর 'ছন্দোমঞ্জরী' বৈদ্য গোপালদাসের পুত্র গঙ্গাদাসের লেখা। বৌদ্ধদের একখানি খুব বড় অঙ্গের ছন্দের বই ছিল, লেখক—রত্নাকর শান্তি। ইনি বিক্রমশীল বিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন এবং একজন প্রসিদ্ধ তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। অধিক বলিতে কি, ইনি দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু আর দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বত-দেশে এখনও দ্বিতীয় বুদ্ধদেব বলিয়া পূজা পাইয়া থাকেন। কিন্তু এত বড় যে রত্নাকরশান্তি, তাঁহারও ছন্দের বই টিকিল না—লোপ পাইল।

অলঙ্কার

ভামহ যদি বৌদ্ধ না হন—না হইবার সম্ভাবনা অধিক—তবে বৌদ্ধদের অলঙ্কারের বই সব লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে যে অলঙ্কারের বই ছিল না বা অলঙ্কারের চর্চ্চা ছিল না, এ কথাও বলিতে পারি না। কারণ, কালিদাসের কাব্যগুলির তীব্র সমালোচনা বৌদ্ধদের হাতেই হইয়াছিল। এ কথা মল্লিনাথ বলিয়া গিয়াছেন এবং সমালোচক যে-সে লোক নন—স্বয়ং দিঙ্‌নাগ।

ন্যায়

ন্যায়শাস্ত্রে অর্থাৎ লজিকে বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা খুব উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সব বই লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল বইএর তর্জ্জমা এশিয়ার নানা ভাষায় দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব আমাদের মীমাংসকদের ন্যায় ৭।৮টি প্রমাণ মানিতেন। কিন্তু ক্রমে খসিয়া খসিয়া প্রমাণগুলি নাগার্জ্জুনের সময় চারিটিতে দাঁড়ায়—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। মৈত্রেয়নাথ উপমান পরিহার করেন, তাহার পর দিঙ্‌নাগ শব্দকেও প্রমাণের লিষ্ট হইতে বাদ দেন।

তখন বৌদ্ধদেব দুইটি মাত্র প্রমাণ দাঁড়াব—প্রত্যক্ষ আব অনুমান। আমাদেব ন্যায়সূত্রখানি নাগার্জ্জুনেব সময়ে বা তাহার একটু পবে লেখা হয। ইঁহাবাও ৪টি প্রমাণ মানিলেন। ইঁহাবা সেই চাবিটিই ধবিয়া আছেন এবং বৌদ্ধদেব সঙ্গে প্রমাণ লইয়া ঘোবতব তর্ক কবিয়া আসিতেছেন। বাৎস্যায়ন, ন্যায়বার্ত্তিককাব বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি সকলেই চাবিটি প্রমাণ স্থাপন কবিবাব চেষ্টা কবিয়াছেন। দিঙ্‌নাগ, ধর্ম্মকীর্ত্তি, ধর্ম্মোদয, শীলভদ্র প্রভৃতি সকলেই দুই প্রমাণ মানিয়া গিয়াছেন এবং দুই প্রমাণ স্থাপনেব জন্য তুমুল তর্ক কবিয়া গিয়াছেন।

প্রত্যক্ষেব লক্ষণ কবিতে গিয়া আমাদেব নৈয়ায়িকেবা ন্যাযসূত্রেব লক্ষণই খাঁটি বাখিতে চেষ্টা কবিয়াছেন। কিন্তু বৌদ্ধেবা সে লক্ষণ পবিহাব কবিয়া কল্পনাপোঢ প্রথম ও তাহাব পব "কাল্পনাপোঢমভ্রান্তম্" লক্ষণ স্থিব কবিযাছেন।

আমাদেব গৌতমসূত্র তিনরূপ অনুমান স্বীকাব কবেন,—(১) পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ কাবণ হইতে কার্য্য, (২) শেষবৎ অর্থাৎ কার্য্য হইতে কাবণ এবং (৩) সামান্যতো দৃষ্ট। বৌদ্ধেবা দুইরূপ অনুমান মানেন—স্বার্থানুমান ও পবার্থানুমান। ইহাব মধ্যে পবার্থানুমানেব জন্যই অবয়বেব দবকাব হয; অবযব অর্থাৎ সিলোজিসম্। আমাদেব নৈয়ায়িকেবা পাঁচটি অবয়ব মানেন, বৌদ্ধেবা তিনটি বই মানেন না। তাহাদেব পুস্তকসমূহে অনুমানেব যে প্রয়োগ খাটান, তাহাতে উদাহবণ, উপনয় ও নিগমন, এই তিনটি অবয়ব দেখান। কিন্তু আমাদেব পঞ্চ অবযব শুদ্ধ অনুমানেব মূল নহে, উহা তর্কেব মূল, তর্ক কবিতে বসিলেই অবযব সাজাইতে হয। গোতম, আমাদেব অবয়ব অনুমানপ্রমাণেব মধ্যে না দিয়া, দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তেব পব দিযাছেন। অর্থাৎ অনুমান ছাড়া অন্যত্রও অবয়বেব দবকাব হয। কিন্তু অবযব সাজান বড জটিল ব্যাপাব দেখিয়া আমাদেব নৈযাযিকেবা ব্যাপ্তি ও পক্ষধর্ম্মতা, এই দুইটিকেই অনুমানেব কাবণ বলিয়া নির্ণয় কবিয়াছেন এবং ব্যাপ্তিব লক্ষণ কবিতে গিয়া অসাধাবণ সূক্ষ্মদর্শিতাব পবিচয় দিযাছেন। ব্যাপ্তিব পক্ষধর্ম্মতা অবয়বেবই সাব কথা। উদাহবণ হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয, ব্যাপ্তিজ্ঞান হইলে তাহাব একটি যদি পক্ষে অথবা পর্ব্বতে থাকে, তবেই অনুমান হয। কিন্তু ব্যাপ্তি শব্দটা এবং ব্যাপ্তিব ধাবণাটা কোন্ পক্ষ হইতে উঠে, তাহা ঠিক বলা যায় না। বোধ হয, বৌদ্ধ পক্ষ হইতেই প্রথম উঠে।

কিন্তু উদাহবণ হইতে যে ব্যাপ্তিজ্ঞান উঠে, তাহাতে অনেক সময় উদাহবণ পাওয়া যায না। বহ্নি ও ধূম স্থলে অনেক জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়, বহ্নি ও ধূম এক জায়গায়। কিন্তু উচ্চ অনুমান স্থলে, যথা—ঈশ্ববানুমান অথবা ধর্ম্মকায়ানুমানে, উদাহবণ পাওযা যায় না। সেখানে বৌদ্ধেবা সাহস কবিয়া বলিয়া ফেলিলেন, উদাহবণ ব্যতিবেকেও ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়; উহাব নাম অন্তর্ব্যাপ্তি। অন্তর্ব্যাপ্তিব উপব বত্নাকবশান্তিব এক বই আছে; তাহাব নাম অন্তব্যাপ্তিসমর্থন। বত্নাকবশান্তি খ্রীষ্টীয় ১০৩৮ সালেও জীবিত ছিলেন এবং তাঁহাব শিষ্য যখন তিব্বত দেশে যাত্রা কবেন, তখন তিনি বিস্তব নিষেধ কবিয়াছিলেন। কিন্তু সে নিষেধ তিনি শুনেন নাই।

বাব শতকেব শেষ ভাগে মিথিলায় মঙ্গলবনী নামক গ্রামে গঙ্গেশোপাধ্যায় আমাদেব ন্যায়শাস্ত্র ঘুঁটিয়া চাবিটি প্রমাণেব উপব চাবিখানি চিন্তামণি বচনা কবেন। চাবিখানিব সাধাবণ নাম 'তত্ত্বচিন্তামণি'। এই পুস্তক বচনা বা সঙ্কলনেব উদ্দেশ্য—"প্রচণ্ডপাষণ্ডতমস্তিতীর্ষয়া," অর্থাৎ বৌদ্ধদিগের প্রচণ্ড মত খণ্ডন কবা। গঙ্গেশোপাধ্যাযেব বই আমাদেব দেশে মূল বলিযা

বিখ্যাত। এই মূলের বহুসংখ্যক টীকা হইয়াছে। এই সকল টীকার প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ন্যায়শাস্ত্র বাঙ্গালা—এমন কি, ভারতবর্ষ হইতেও তিরোহিত হইয়াছে। দু একখানি ন্যায়ের গ্রন্থ পশ্চিম-ভারতের জৈনভাণ্ডার হইতে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, ন্যায়শাস্ত্র বৌদ্ধেরা খুব সোজা করিয়া আনিয়াছেন। আর আমাদের ন্যায়শাস্ত্র এখন ক্রমে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া শেষে দুর্ব্বোধ হইয়া পড়িয়াছে।

বৌদ্ধ দর্শন প্রথম হইতেই ক্ষণিকবাদী। এখনকার নৈয়ায়িকেরা বলেন, জ্ঞান ত্রিক্ষণস্থায়ী—এক ক্ষণে উৎপত্তি, দ্বিতীয় ক্ষণে স্থিতি ও তৃতীয় ক্ষণে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। বৌদ্ধেরা বলেন, উহার উৎপত্তি ও ধ্বংস এক ক্ষণেই হয়, উহার স্থিতি নাই। উহারা দুই সত্য মানেন—এক সাম্বৃত সত্য, আর এক পরমার্থসত্য। সাম্বৃত সত্য পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায়, উহার মূল নাই, উহা মায়া। আরও পরীক্ষা করিতে করিতে দেখা যায় যে, সে মায়াও নাই। এই মাধ্যমিকদের শেষ বিচার। ইহার নাম অপ্রতিষ্ঠিতসর্ব্বধর্ম্মবাদ। উহাদের পরমার্থসত্য ধর্ম্মধাতু। ধর্ম্মধাতু অনির্ব্বচনীয়, উহার আর এক নাম শূন্য। শূন্য অভাববাদ নয়, ভাববাদও নয়, উহা অনির্ব্বাচ্য একটা স্বরূপ—যাহা বাক্য মনের অগোচর। উহা অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অচ্ছিদ্র, দৃঢ়, সার, অদাহি, অবিনাশি,—এই শূন্যতার নামই বজ্র। ইহা ভাব নয়, অভাব নয়, ভাবাভাব নয়, অভাবাভাব ভাবাভাবও নয়। মানে আমরা উহা ধারণা করিতে পারি না অথচ উহা যে আছে, তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না।

এই যে সূক্ষ্ম দার্শনিক মত বৌদ্ধদের মধ্যে ছিল, তাহা দুই দিক্ হইতে হিন্দুরা আক্রমণ করিয়া খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এক দিকে শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদাচার্য্য এই সমস্তগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আপনাদের মত প্রচার করিয়াছেন। গৌড়পাদ তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকায় এবং শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে এই মতই প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধদের বোধিচর্য্যাবতারের নবম পরিচ্ছেদ, প্রজ্ঞাপারমিতাবতার পড়িয়া যাঁহারা শঙ্কর ও গৌড়পাদের এই দুখানি বই পড়িবেন, তাঁহাদের এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারিবে না। শঙ্করের পরবর্ত্তী পণ্ডিতেরা বলিতেন,—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব তৎ।" এখন দুই হাতে দুই মতের বই লইয়া পড়িলে প্রচ্ছন্ন শব্দটা আর ব্যবহার করিতে ইচ্ছা হইবে না, মনে হইবে,—"প্রকাশং বৌদ্ধমেব তৎ।" তবে গৌড়পাদ ও শঙ্কর উপনিষদ্ প্রভৃতি হইতে এই মত সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া উহা সৎশাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। আর বৌদ্ধেরা বেদ মানেন না বলিয়া উহা অসচ্ছাস্ত্র হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু দেখিতে হইবে, মায়া জিনিষটা নাগার্জ্জুন ২য় শতকে লেখেন আর শঙ্কর সেটা ৮ম শতকে গ্রহণ করেন। ইংরাজী ১৮ শতকের গোড়ায় একখানি বই বাঙ্গালায় রাঢ়দেশে লেখা হয়, সেখানির নাম 'বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী'। তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচারের কথা লেখা আছে। যখন বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক পরস্পর বিচার করিতে আসিলেন, বৌদ্ধ বেদান্তীকে কহিলেন,—ভাই, তোমায় আমায় কিছুই ভেদ নাই। কেবল তুমি বল, "আছে আছে", আমি বলি,—"নাই"। অর্থাৎ তুমি বল,—ব্রহ্ম, আমি বলি,—শূন্য। কিন্তু কাজে আমরা দুই জনেই এক।

বাঙ্গালার ব্রাহ্মণেরা কিন্তু এরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে যুদ্ধ করেন নাই। তাঁহারা "তোর শিল তোর নোড়া, তোরই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া" করেন নাই। তাঁহারা ন্যায় ও বৈশেষিক,

এই দুইটি দর্শনের ঐক্য করিয়া বৌদ্ধদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের প্রধান আচার্য্য উদয়ন। তিনি 'দ্রব্যকিরণাবলী' ও 'গুণকিরণাবলী' নামে বৈশেষিকের টীকা লিখিয়া তাহার পর 'আত্মানাত্মবিবেক' রচনা করেন। ইহার প্রথমেই তিনি আত্মসম্বন্ধে যতরূপ মত হইতে পারে, সেগুলিকে কয়েকটি ভাগ করিয়াছেন। তাহার পর তাহাদের আবার যত অবান্তর মত হইতে পারে, তাহার উল্লেখ করিয়া, এক এক করিয়া খণ্ডন করেন ও তাহার পর আপনাদের ন্যায়-বৈশেষিকের জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্থাপন করেন। তাহার মতের সারসংগ্রহ হইতেছে—গঙ্গেশের অনুমানখণ্ডের ঈশ্বরানুমান অধ্যায়। এই মত যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, বৌদ্ধেরা ততই হঠিতে লাগিল। আত্মানাত্মবিবেকের নাম হইল বৌদ্ধ-ধিক্কার, একটু সাধু ভাষায় উহার নাম হইল বৌদ্ধাধিকার। এক শত বৎসর পূর্ব্বে অনেক নৈয়ায়িকই এই বই পড়িতেন ও পড়াইতেন। কিন্তু বৌদ্ধমত, বৌদ্ধদের পুথি হইতে, তাঁহাদের জানা না থাকায় বলিতেন, এ অতি কঠিন গ্রন্থ। বৌদ্ধেরা যে ন্যায়-বৈশেষিক মতের প্রভাবেই হঠিয়াছিলেন, এ কথা বলা যায় না। দেশে মসলমান অধিকার হওয়ায় তাহাদের শাস্ত্র ও ধর্ম্মের লোপ হইয়াছে, এও একটা কারণ। বৌদ্ধদের সঙ্গে যখন ন্যায়-বৈশেষিক-ওয়ালাদের বিচার হয়, সে সময় তর্কবিতর্কের যে সকল বই লেখা হয়, তাহার মধ্যে বৌদ্ধদের দুচারখানি আমি পাইয়াছি ও ছাপাইয়াছি। একখানির নাম—'সামান্যদূষণদিক্-প্রসারিতা'। বৌদ্ধেরা ক্ষণিকবাদী। তাহারা এক ক্ষণে একটিমাত্র পদার্থ দেখে, সুতরাং অনেক পদার্থ লইয়া যে সামান্য বা জাতি হয়, তাহারা তাহা মানে না। তাহারা বলে, গাছ বুঝি, কিন্তু বন বুঝি না। তাহারা বলে, তোমার হাতে ত পাঁচটা আঙ্গুল আছে, সামান্য মানিলে ত ছয়টা মানিতে হয়, কিন্তু তোমরা ত সকলে ছ-আঙ্গুলে নও।

স্মৃতি

স্মৃতি বলিতে কি বুঝায়? শঙ্করাচার্য্য এক জায়গায় মহাভারতকে স্মৃতি বলিয়াছেন, আর এক জায়গায় গীতাকে স্মৃতি বলিয়াছেন। মনুস্মৃতিতে ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, অর্থশাস্ত্র আছে, মোক্ষশাস্ত্রও আছে। ব্রাহ্মণের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি স্মৃতিতে আছে। তাঁহারা বলেন, অন্য অন্য জাতি আমাদের দেখিয়া শিখুক। বৌদ্ধদের বিনয়—সে বুদ্ধের হুকুম, পুরাণ ধার্ম্মিক লোকের স্মৃতি নহে। সে বিনয়ও ভিক্ষুদের জন্য, গৃহস্থের জন্য নহে। তবে যে গৃহস্থ ভিক্ষু হইতে যাইবে, সে বিনয়-মত ব্যবহার করিবে। কিন্তু সকলের ত ভিক্ষু হওয়ার উদ্দেশ্য নয়, তাহারা কি করিবে? এ কথার এক উত্তর, তাহারা ব্রাহ্মণদের আচার ব্যবহার অনুকরণ করিবে। তাই বৌদ্ধধর্ম্মে স্মৃতির উল্লেখ বড় দেখা যায় না। রাজকার্য্য ব্রাহ্মণে করিতেন, ধর্ম্মকার্য্যও ব্রাহ্মণেই করিতেন। বিচার ব্রাহ্মণের হাতেই ছিল। তাই যখন বৌদ্ধেরা খুব প্রবল, তখনও ব্রাহ্মণ সমাজের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন।

ব্রাহ্মণের স্মৃতি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, যত দিন যাইতে লাগিল এবং সমাজের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, অনেক বিষয় স্মৃতি হইতে খসিয়া পড়িল, আবার অনেক জিনিষ তাহাতে আসিয়া জুটিতে লাগিল। দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা মনুতে দেখা যায় না। যখন শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রবল হইতে লাগিলেন, তখন প্রতিষ্ঠা ব্যাপারটা স্মৃতিভুক্ত হইয়া গেল। দীক্ষা বহুকাল স্মৃতির বাহিরে ছিল। বৈদিক দীক্ষা বেদে ও বৈদিক বইএ ছিল। তান্ত্রিক দীক্ষা তন্ত্রে ছিল।

স্মার্ত্ত দীক্ষা ছিল না, পৌরাণিক দীক্ষাও ছিল না। কিন্তু রঘুনন্দন দীক্ষার উপর এক তত্ত্ব লিখিয়া গেলেন। বৌদ্ধদের স্মৃতির বই নাই। কিন্তু ৯।১০ শতকে লেখা কয়েকখানি স্মৃতির বই আমার হস্তগত হইয়াছে। অধিকাংশ গুপ্ত উপাধিধারী বৌদ্ধদের লেখা; তাহার ব্যাপার দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, অবৌদ্ধকে দীক্ষা দেওয়া (নাম—আদিকর্ম্ম), দিনের কাজ, বার-ব্রত ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল বইএর সংখ্যা বড় কম। তবুও উহাতে কোটেশন আছে, তাহাতে মনে হয়, আরও ছিল—লোপ হইয়াছে। এ সকল কিন্তু বিনয় ছাড়া।

আমার মনে হয়, বৌদ্ধ স্মৃতির বিষয়গুলি শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রথম গ্রহণ করেন, তাঁহাদের কাছ হইতে ব্রাহ্মণেরা লইয়াছেন।

মুসলমান অধিকারের সূত্রপাত হইতেই হিন্দুরা সমাজ বজায় রাখিবার জন্য যেখানে তাঁহাদের রাজক্ষমতা লাভ হইয়াছে, নিবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন ভিন্ন জাতির উপকারার্থ এরূপ প্রায় দুই শত নিবন্ধ লেখা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রায় পঞ্চাশখানা আস্ত পাওয়া গিয়াছে। "আস্ত নিবন্ধ" বলিতে রঘুনন্দনের ২৮ তত্ত্বের মত বড় বড় নিবন্ধ। আর ১৫০ খানার খণ্ড পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লেখাই আছে, এটা অমুক আস্ত নিবন্ধের খণ্ড। এ ছাড়া আবার স্মৃতির ভিন্ন ভিন্ন বিষয় লইয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রবন্ধও আছে।

এই যে বিশাল নিবন্ধ-সাহিত্য, ইহাতে বৌদ্ধদের স্মৃতি একেই ত কম, সব মিশিয়া গিয়াছে, আর বাকী লোপ হইয়াছে। মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, তান্ত্রিক দীক্ষা, দেবপ্রতিষ্ঠা, মন্দির নির্ম্মাণ, এ সব আমরা লইয়াছি। আর বৌদ্ধদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের স্মৃতি চলিয়া গিয়াছে। বিনয়ে বৌদ্ধেরা যে পঞ্চ শীল, অষ্ট শীল, দশ শীল লইয়াছিলেন এবং তাহার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভেদ বাহির করিয়া একটা প্রকাণ্ড জিনিষ করিয়াছিলেন, তাহাকেও আমরা লই নাই। তাঁহাদের স্মৃতিতে জাতিভেদেরও লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।

তন্ত্র

তন্ত্রের উৎপত্তি লইয়া নানা মত আছে। ব্রাহ্মণেরা বলেন, উহা অথর্ব্ববেদের অংশ। যাহার কিছু গোড়া পাওয়া যায় না, তাহাই অথর্ব্ববেদ। এ কথার কি মূল্য জানি না। আমি গুপ্তাক্ষরের শেষ অবস্থায় লেখা দুখানি পুথি দেখিয়াছি। একখানিতে ঋচীক ও মতঙ্গ কথা কহিতেছেন নৈমিষারণ্যে। একজন বলিতেছেন, এ আবার কি হইল? আমরা ত বৈদিক দীক্ষাই জানি, এখন আবার এ একটা কি দীক্ষা আইল? ইহাকে তান্ত্রিক দীক্ষা বলে। আর একজন বলেন, তান্ত্রিকও পুরাণ দীক্ষা—বিষ্ণু শিবের নিকট এই দীক্ষা লইয়াছিলেন। সুতরাং তন্ত্রের গোড়া ত এইখানেই পাওয়া গেল।

আর একখানি পুথিও ঐ অক্ষরেই লেখা। এখানির নাম 'কুলালিকাম্নায়' বা 'কুব্জিকা-মত'। ইহাতে ঈশ্বর দেবীকে বলিতেছেন,—

"গচ্ছ ত্বং ভারতে বর্ষে অধিকারায় সর্ব্বতঃ।"
"যাবন্নৈবাধিকারস্তে ন সঙ্গমস্তয়া সহ॥"

ইহাতে বুঝা যাইতেছে, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে আসিয়াছে। বলিবে, কৈলাস পর্ব্বত হইতে আসিয়াছে। কিন্তু কৈলাস ত ভারতবর্ষের বাহিরে বলিয়া কেহ বলে না। পুথি দুখানিই ৮ম শতকের শেষ ভাগের লেখা।

আমার বোধ হয়, খৃঃ ৭ ও ৮ শতকে যখন উম্মেদিয়া ও আব্বাসিয়া খলিফাগণ তুর্কীস্তানে আপনাদের আধিপত্য ও ইসলামধর্ম্ম বিস্তার করিতেছিলেন, তখন সেখানে নানা রকমের লোক-চলিত ধর্ম্ম ছিল। তাঁহারা সে সকল ধর্ম্ম নষ্ট করায় তাহাদের পুরোহিতেরা পলাইয়া ভারতে আসেন, তাঁহারাই তন্ত্র এ দেশে প্রচার করেন। তখন ভারতে কোথাও তন্ত্র ছিল না, তাহার কারণ, জলন্ধর, কামাখ্যা, ওড্ডিয়ান, পূর্ণা, শ্রীপর্ব্বত, এই সকল স্থানই দেবী দখল করেন ও সেই সব স্থান হইতে ভারতবর্ষে নানা দেশে উহার প্রচার হয়। আমার মনে হয়, এ-ই তন্ত্রের গোড়া। তন্ত্র শব্দ ইহার পূর্ব্বে ছিল। বরাহমিহিরের টীকাকার ভট্ট উৎপল নানা তন্ত্রের নাম করিয়া গিয়াছেন, সে সমস্তই কিন্তু জ্যোতিষের নাম।

সকল তন্ত্রেই দেখিতে পাই, অন্য অন্য তন্ত্রের নাম করিয়াছে। কিন্তু আমার দুইখানি পুথিতে পূর্ব্ববর্ত্তী তন্ত্রের নাম নাই। একবার কেবল আছে, "পূর্ব্বতন্ত্রে" কোনও তন্ত্রের নাম নাই। এই সকল কারণে আমার মনে হয়, তন্ত্র ভারতের বাহির হইতে ৭।৮ শতকে আসে এবং ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। বৌদ্ধেরা তখন প্রবল, উহারা সেই তন্ত্র লইয়া আপনাদের প্রচার-কার্য্যে নিয়োগ করে। ব্রাহ্মণেরা ধর্ম্মপ্রচার করিতেন না, তাঁহারা লন নাই। শৈব ও বৈষ্ণবেরা প্রচার করে, উহারাও লইয়াছিল। শৈবেরা "তন্ত্র" বলিত আর বৈষ্ণবেরা বলিত "পঞ্চরাত্র"। ঐ বাহিরের আসা জিনিষ ভারতে আসিয়া খুব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাঙ্গালায় পঞ্চরাত্র বড় ছিল না, পঞ্চরাত্রের দুই শতের উপর বই আছে। বাঙ্গালায় তাহার কিছুই পাওয়া যায় না। একখানি পঞ্চরাত্র এশিয়াটিক সোসাইটী বাঙ্গালা হইতে সংগ্রহ করিয়া ছাপাইয়াছিল —উহা 'নারদপঞ্চরাত্র'। কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে—উহা জাল। শৈব তন্ত্রগুলি কাশ্মীরে ও মধ্যভারতে বেশী, উহাদেরও বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। বাঙ্গালায় যাহা পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই বৌদ্ধ তন্ত্র ভাঙ্গা। বাঙ্গালায় বৌদ্ধ তন্ত্রের প্রধান আড্ডা ছিল। বিক্রমশীল বিহারে, (ভাগলপুরের কাছে) জগদ্দল বিহারে ও নালন্দাতেও শেষ অবস্থায় অনেক তন্ত্র জন্মিয়াছিল। বৌদ্ধ বিহার মাত্রেই তন্ত্র ছিল। সুতরাং বাঙ্গালায় বৌদ্ধ তন্ত্রেরই প্রাদুর্ভাব বেশী হইয়াছিল।

শেষ সময় পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের লেখা তন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, উহাঁরা বেদ স্মৃতি লইয়াই বেশী থাকিতেন। গুণ্ডাচার্য্যের বেদের টীকাই বোধ হয়, বেদের আদি টীকা। উহা লোপ পাইয়াছে। ভবদেব, নারায়ণ, হলায়ুধ, পশুপতি, জীমূতবাহন, ইঁহারা বেদ ও স্মৃতি লইয়াই থাকিতেন।

বৌদ্ধ তন্ত্রই বাঙ্গালায় খুব বেশী ছিল। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা তন্ত্রে বেশী মন দিতে পারেন নাই। কিন্তু মুসলমান অধিকারের পর দুই শত বৎসরের ইতিহাস পাওয়া যায় না, যাইবার কথাও নয়। মুসলমান অধিকারের আরম্ভ হইতেই মারামারি কাটাকাটি বেশী আরম্ভ হয়। তাহাতে হিন্দু অপেক্ষা বৌদ্ধদেরই ক্ষতি বেশী হয়। ভিক্ষুরা হয় কাটা পড়ে অথবা পলাইয়া যায়। তাহাদের বিহার লুঠ হয়। ঠাকুর সব ভাঙ্গা পড়ে। মুসলমানেরাও বড় সুস্থির ছিল না। বক্তিয়ার খিলিজি গৌড় দখল করিয়া আসাম আক্রমণ করিয়া দখল করেন। তাহার পর প্রচুর সৈন্য সঙ্গে তিব্বত দখল করিতে যান। সেখানে তিনি কিছুই করিতে পারেন নাই। অনেক সৈন্য মারা যায়। ফিরিয়া আসিবার পথে আসামীরা অবশিষ্ট সৈন্য জলে ভাসাইয়া দেয়। বক্তিয়ার ২০টি মাত্র সিপাহী লইয়া ঘোড়াঘাটে উপস্থিত হন।

এবং ক্ষোভে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার পর আলি মর্দ্দান নামক একজন বাঙ্গালার কর্ত্তা হন। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বেশী দিন থাকে নাই। তাঁহার পর হইতে ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালায় আসে, সেই স্বাধীন হইতে চেষ্টা করে, আর দিল্লী হইতে তাহাকে দমন করিবার চেষ্টা হয়। ক্রমে বাঙ্গালার নাম "ঝগড়ার দেশ" হইয়া উঠিল। একবার ১২৮০ সালে গিয়াসুদ্দীন বুলবন বাঙ্গালায় আসেন। তিনি সোনারগাঁএর 'রায়' বা রাজার সঙ্গে সন্ধি করেন। অনেক লোক মারিয়া মুসলমান-বিদ্রোহ দমন করেন ও আপনার বড় ছেলেকে বাঙ্গালার কর্ত্তা করিয়া দিয়া যান, এবং বলিয়া যান যে, তুমি যদি দিল্লী হইতে পৃথক হইতে চাও, তোমাকেও শূলে দিব। তিনি আবার বাঙ্গালাকে এত ভালবাসিতেন যে, দিল্লীর সিংহাসনে নিজের ছেলেকে বসাইয়া নিজে বাঙ্গালায় রহিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র ও পৌত্রকে দিল্লীর সুলতানেরাও সুলতান বলিত। এই তিন পুরুষেই তাঁহারা পূর্ব্ববাঙ্গালার হিন্দু রাজত্ব লোপ করেন। আবার ১৩২৫ সালে জেলালউদ্দীন খিলিজি বাঙ্গালায় আসিয়া বাঙ্গালা তিন ভাগে ভাগ করিয়া দিয়া যান—সাতগাঁ, গৌড় ও সোনার গাঁ। এই তিন কর্ত্তায় আবার ঘোরতর লড়াই ঝগড়া বাধান এবং শেষ ১৩২৫ সালে শমসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সমস্ত বাঙ্গালার রাজা হন। হিন্দু ব্রাহ্মণেরা ইঁহার খুব সাহায্য করিয়াছিলেন। ইঁহারা তিন পুরুষে বাঙ্গালায় কতক শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদের পর রাজা গণেশ বাঙ্গালার কর্ত্তা হন এবং তিন পুরুষ রাজত্ব করেন। এই সময় হইতেই বাঙ্গালা আবার গজাইতে আরম্ভ করে। ইঁহারা একজন ব্রাহ্মণকে খুব সম্মান করিতেন। তাঁহার কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। তিনি শুদ্ধ অমরকোষের টীকা লিখিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহা হইতেই বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের চর্চ্চা বাঙ্গালায় নব-জীবন লাভ করে। দুই শত বৎসর বাঙ্গালায় যে কি দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, বলা যায় না। এই দুই শত বৎসরের মধ্যে যে, কোনও বাঙ্গালা বা সংস্কৃত বই লেখা হইয়াছিল, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। এমন কি, কোন সংস্কৃত বা বাঙ্গালা বই যে কপি করা হইয়াছিল, তাহাও পাই নাই। ইতিহাসের মধ্যে এই দুই শত বৎসর যেন সব শাদা।

বৃহস্পতি হইতে আবার বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের নব-জীবন। বৃহস্পতি কতকগুলি চলিত সংস্কৃত কাব্যের টীকা লিখিয়া, তাহাদের পঠন-পাঠনের সুবিধা করিয়া দেন এবং 'স্মৃতিকণ্ঠহার' নামে একখানি স্মৃতির বই লিখিয়া হিন্দুর সমাজ বাঁধিবার চেষ্টা করেন। তাঁহারই সময় কৃত্তিবাস বড় গঙ্গা পার হইয়া, গৌড়ে আসিয়া সুলতানের কাছে আদর ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হন। মিথিলায় বিদ্যাপতি এই সময়েই তাঁহার সুমধুর গানে দেশ মুগ্ধ করেন এবং তাঁহার শৈব ও স্মার্ত্ত পুস্তকসকল রচনা করেন। চণ্ডীদাসও এই সময়ে তাঁহার গানে বাঙ্গালায় একটা নূতন জাগরণ আনিয়া দেন। সুতরাং গণেশবংশীয় রাজাদের সময়েই বাঙ্গালার হিন্দুসমাজের জাগরণ হয়। এ সময়েও বৌদ্ধেরা বেশ প্রবল ছিলেন। ১৪২৬, ১৪৩৬ ও ১৪৪৪ সালেও বাঙ্গালায় ভাল ভাল বৌদ্ধ গ্রন্থ কপি করা হয়। বর্দ্ধমানের বেণুগ্রামের মিত্রেরা 'বোধিচর্য্যাবতার' কপি করাইয়াছিলেন। একজন ভিক্ষু লিখিয়াছিলেন, আর একজন সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন এবং আর এক ব্যক্তির পড়ার জন্য কপি করা। মিত্র মহাশয় নিজে ও তাঁহার পুত্র দুই জনই 'বোধিচর্য্যাবতার' পড়িয়াছিলেন।

১৪০০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিতেছিলেন

আর বৌদ্ধেরাও স্বধর্ম্মের গ্রন্থ সকল পাঠ করিতেছিলেন। সে সময়েও ব্রাহ্মণেরা বৌদ্ধ কাব্য ও বৌদ্ধ ধর্ম্মপুস্তক পড়িতেন ও তাহা হইতে উদ্ধার করিতেন।

মুসলমান অধিকারের পূর্ব্বেও বৌদ্ধদের অনেক তন্ত্রের বই ছিল। কিন্তু ঐ অধিকারের পর হইতে আর বড় একটা তাঁহাদের বাঙ্গালাদেশে লেখা তন্ত্রের বই দেখা যায় না। বৃহস্পতি রায় মুকুটের সময় ব্রাহ্মণদের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য নামে একজন আবির্ভূত হইয়া তন্ত্র প্রচার আরম্ভ করেন। বড় শঙ্করাচার্য্য হইতে তাঁহাকে পৃথক্ করিবার জন্য তাঁহার নাম হইয়াছে গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য্য। তিনি অনেক বই লেখেন। লোকে বলে, তাঁহার বংশধরেরা আজিও রাঢ়দেশে হুগলী জেলায় বাস করিতেছেন। তিনি কালীমন্ত্রের উপাসক ছিলেন এবং অনেক বইও লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে ৫।৬ খানা বই পাওয়া গিয়াছে। 'প্রপঞ্চসার' বড় শঙ্করাচার্য্যের নামে চলিতেছে। কিন্তু পড়িলে উহা একেবারে অদ্বৈতাচার্য্যের লেখা বলিয়া বোধ হয় না। যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কমলাকরের পুত্র শঙ্কর। তাঁহার অনেক চেলা ছিলেন, সকলেই কালীবাড়ী স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আমার বোধ হয়, আমড়াঙ্গার কালীবাড়ী তাঁহারই কোন চেলার তৈয়ারী। উহাতে ১৮৮০ সাল পর্য্যন্ত ১৪টি সমাজ ছিল। সমাজগুলি ঐ কালীবাড়ীর মোহান্তদিগের। পাজীতে এক শঙ্করাব্দ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের জন্মের ৩৬ বৎসর পূর্ব্বে উহার আরম্ভ। উহা এই শঙ্করাচার্য্য প্রবর্ত্তন করেন। উনি বৌদ্ধদের তন্ত্র হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন। অনেক বৌদ্ধ সংকেত ও অনেক বৌদ্ধ নাম ইঁহার পুথিতে পাওয়া যায়।

কিন্তু যাঁহারা বৌদ্ধতন্ত্র পূর্ব্ববাঙ্গালায় হিন্দুদের মধ্যে প্রচার করেন, তাঁহারা তিন জন,—ত্রিগুণানন্দ, তাঁহার চেলা ব্রহ্মানন্দ ও তাঁহার চেলা পূর্ণানন্দ। পূর্ণানন্দের 'তত্ত্বচিন্তামণি' ১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে লেখা। সুতরাং তাঁহাদের সময় ১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে। ইঁহাদের এক গাড়ী বই পওয়া যায়। রসিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের অনেকগুলি বই ছাপাইয়াছেন। তাহার মধ্যে ব্রহ্মানন্দের 'তারারহস্য' একখানি। সেখানিতে বোধিসত্ত্ব প্রভৃতির কথা আছে। তারা, পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধের একজনের শক্তি। নেপালের বৌদ্ধ পণ্ডিতেরা বলেন যে, তারাই প্রজ্ঞা, বুদ্ধের শক্তিও ধর্ম্মের রূপান্তর বা নামান্তর মাত্র। 'তারারহস্য' পড়িয়া আমারও তাই বোধ হইয়াছিল। উহাতে যে সকল ক্রিয়া দ্বারা সিদ্ধি লাভ হয়, তাহা হিন্দুদের অকথ্য পঞ্চ মকারগুলির সকলেই উহাতে বিদ্যমান আছে, বরং তাহা হইতেও অহিন্দু ব্যবহারের কথা উহাতে আছে। লোকে বলে, ঢাকার রমণার কালীবাড়ী ব্রহ্মানন্দেরই স্থাপিত। উনি ঐ মূর্ত্তি কামাখ্যা হইতে আনিতে আনিতে ঐখানে ক্লান্ত হইয়া পড়েন এবং ঐখানেই তাহাকে স্থাপন করেন। আমার সংস্কার, ইঁহারা তিন জনেই বৌদ্ধ তন্ত্রকে হিন্দু করিয়া দিয়া যান। বৌদ্ধ তন্ত্রগুলি লোপ পায়। আর ইঁহাদের শিষ্য-সেবক বেশী হইয়া উঠে। আমাদের এখানেও কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ অনেকগুলি বৌদ্ধ দেবতাকে তাঁহার তন্ত্রসারে স্থান দিয়াছেন। তাহার মধ্যে দুটি আমার খুব মনে পড়ে—একটি ক্ষেত্রপাল, আর একটি মঞ্জুঘোষ—বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রীর অপভ্রংশ। রাঢ়দেশে শুনিয়া আসিয়াছি, রাঢীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে এখনও মঞ্জুঘোষের উপাসক আছেন। তন্ত্রের এই সকল গ্রন্থকার প্রামাণিক লোক ছিলেন; না দেখিয়া না পড়িয়া তাঁহারা কিছুই লেখেন নাই। তন্ত্রসারের দেবতারা কৃষ্ণানন্দের সময়ে পূজা পাইতেন, তাই তিনি আপন গ্রন্থে তাঁহাদের স্থান দিয়াছেন। কৃষ্ণানন্দের পৌত্র যে 'আগমকল্পলতিকা' বলিয়া বই লেখেন, তাহাতে আরও অনেক

বৌদ্ধ দেবদেবীর পূজাপদ্ধতি দেওয়া আছে। এইরূপে আস্তে আস্তে বৌদ্ধতন্ত্র লোপ পাইল, আর তাহাদের মধ্যে যাহা লইবার ছিল, ব্রাহ্মণেরা সেগুলি আপন তন্ত্রভুক্ত করিয়া লইলেন। কোন কোন বিষয় আপনাদের স্মৃতিতেও উঠাইলেন। এই সকল দেবতা, ক্রিয়া ও পূজা নিজ গ্রন্থভুক্ত করিবার অর্থ কি ? উহাঁদের উপাসক ও পূজকদিগকে আপনাদের ব্রাহ্মণ্যসমাজভুক্ত করিয়া লওয়া।

অন্য কথা কি বলিব, পঞ্চধ্যানী বুদ্ধের পাঁচটি শক্তি আছেন, তাহাদের নাম—রোচনা, মামকী, তারা, পাণ্ডরা, আর্য্যতারিকা। ইহাঁদের মধ্যে—মামকী ও পাণ্ডরার পূজা দুর্গোৎসবের মধ্যে হইয়া থাকে। বৌদ্ধদের যে পঞ্চরক্ষা আছেন—মহাপ্রতিসরা, মহামায়ূরী, মহাশীতবতী, মহাসাহস্রপ্রমর্দ্দিনী, মহামন্ত্রানুসারিণী—দুর্গোৎসবের মধ্যে ইহাঁদেরও পূজা হইয়া থাকে।

অনেক দেবতার ধ্যান বৌদ্ধদেরও যেরূপ, আমাদেরও সেইরূপ। উদাহরণ—ক্ষেত্রপাল, উদাহরণ—কালী। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, বাঙ্গালার বৌদ্ধতন্ত্র ক্রমে হিন্দু তন্ত্রভুক্ত হইয়া গিয়াছে, আর যাহা হয় নাই, তাহা লোপ পাইয়াছে।

বৌদ্ধতন্ত্রের পুথিগুলি এইরূপে হিন্দু হইয়া গিয়াছে। বৌদ্ধদের ত দেবতা নাই। সাংখ্যের ন্যায় বৌদ্ধদর্শনও দেবতাদিগকে মানুষের চেয়ে অধিক ক্ষমতাশালী জীব বলিয়া মনে করে। তাহারা ইন্দ্র চন্দ্রাদির, এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু প্রভৃতিরও পূজা করে না। তবে তাহাদের আর একরূপ দেবতা আছে, সে বোধিজ্ঞানের পর জন্মায়—ধর্ম্মধাতু হইতে তাহার উৎপত্তি। অথবা তাহারা ধর্ম্মধাতুর বিবর্ত্তমাত্র। তাহাদের নামে প্রায়ই বজ্র শব্দ জোড়া থাকে, যেমন বজ্রবারাহী, বজ্রযোগিনী, বজ্রধাত্রীশ্বরী। ভক্ত আপনাকে সেই দেবতাস্বরূপ মনে করিয়া সাধনা করে।

এই সকল দেবতা আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বৌদ্ধদের ত্রিরত্ন আমরা গ্রহণ করিয়াছি। বুদ্ধদেব আমাদের জগন্নাথ হইয়াছেন, তিনি বিষ্ণুর অবতার। বুদ্ধও বিষ্ণুর অবতার হইয়াছেন। ধর্ম্ম ধর্ম্মঠাকুর হইয়াছেন। বৌদ্ধ ত্রিরত্নের মধ্যে ধর্ম্ম অনেক সময় স্তূপের আকারে পূজা পাইতেন। স্তূপের পাঁচ দিকে পাঁচটি কুলুঙ্গি থাকে। তাহাতে দেখিতে কচ্ছপের মত হয়। ধর্ম্মঠাকুরও কচ্ছপাকৃতি। যেখানে ধর্ম্মঘরে যোগী ধর্ম্মঠাকুরের পূজারী, সেখানে ধর্ম্মঠাকুর এখনও বৌদ্ধই আছেন, কেন না, এই যোগী পূজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন না। কিন্তু যেখানে অন্য জাতি পূজারী, সেখানে ধর্ম্মঠাকুর হিন্দু হইয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণে তাঁহার পূজা করেন, অন্ততঃ পূজারীরা ব্রাহ্মণ মানেন।

সংঘ আর দেবতা নাই, তিনি শঙ্খ হইয়া গিয়াছেন। শুনিয়াছি, ময়নায় একটা পুকুর খুঁড়িতে ধর্ম্মঠাকুরের একটা মূর্ত্তি এবং একটা শঙ্খ পাওয়া গিয়াছিল। যে সকল গন্ধবণিক্ সংঘে গন্ধদ্রব্য বিক্রয় করিতেন, তাঁহারা এখন শঙ্খ আশ্রয় হইয়াছেন। আর সংঘ শব্দ এখন আমাদের সাংঘাতের মধ্যে আছেন। যেমন—'সই সাংঘাতিন নাতিন মিতিন।' সংঘ আর দেবতা নাই।

বৌদ্ধ দেবতাগুলি আমরা অত্মসাৎ করিয়া লইয়াছি বটে, তাহাদের হিন্দু পোষাক পরাইবার যত্ন করিয়াছি বটে, তাহাদের অনেকটা রূপান্তর করিয়া ফেলিয়াছি বটে—কিন্তু তাহাদের বীজ এখনও ঠিক আছে। সেটা বৌদ্ধদেরও যাহা ছিল, আমাদেরও তাহাই আছে। এই বীজ দিয়াই ধরা পড়ে—কে কাহার কাছ হইতে ধার লইয়াছে। আমাদের তান্ত্রিক দেবতার

বীজের আমরা অর্থ করিতে পারি না। কেন এই বীজে এই দেবতা হয়, তাহাও বলিতে পারি না। কিন্তু বৌদ্ধেরা ঠিক পারে। তাহাদের বীজ হইতেই দেবতার চেহারার আদরা আসে। আমাদের আসে না। তাই বোধ হয়, আমরাই ঋণী ও বৌদ্ধেরা মহাজন।

দেখন না, আমরা যখন "ধ্যায়েন্নিত্যং," "ধ্যেয়ঃ সদা" ইত্যাদি মন্ত্রে শিব বিষ্ণু ইত্যাদি দেবতার ধ্যান করি, তখন আমরা হিন্দু। আর যখন "আত্মানং বিষ্ণুস্বরূপং বিভাব্য" বলিয়া পূজা করি, তখন আমরা বৌদ্ধ। যখন আমরা লিঙ্গমূলে বীজমন্ত্র ধ্যান করি, তাহার পর অনাহতে তাহাকে উজ্জ্বল করিয়া তুলি, নাভিমূলে তাহাকে স্বর্ণবর্ণ দেখি, হৃদয়ে তাহার হস্তপদ বাহির হয়, কণ্ঠদেশে সে স্পষ্ট দেবমূর্ত্তি হয়, আর আজ্ঞাচক্রে মস্তকে সহস্রদল পদ্ম নিম্নাভিমুখ রহিয়াছে, তাহা হইতে নিঃসৃত ক্ষীরধারা ভক্ষণ করি, তখন আমরা খাঁটি বৌদ্ধ। আমরা যখন—

"অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

বলি, তখন আমরা বৌদ্ধ। আবার যখন আমরা বলি,—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

তখনও আমরা বৌদ্ধ। বুদ্ধ শব্দে প্রথম প্রথম কল্যাণমিত্র বুঝাইত, ক্রমে উহা গুরুতে আসিয়া দাঁড়ায়। লামা শব্দের অর্থ গুরু, বৌদ্ধেরা গুরু ভজনা করে, তাই তাহারা 'গুভাজু'। আর আমরা দেবতা ভজনা করি বলিয়া আমরা 'দেবভাজু'। আমরা বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা এখন অর্দ্ধ-হিন্দু, অর্দ্ধ-বৌদ্ধ। যখন আমরা সাবিত্রী দীক্ষা লই, তখন আমরা ব্রাহ্মণ। আর যখন গুরু আমাদের কাণে ফুঁ দিয়া যান, আর আমরা গুরুর পায়ে লুটাইয়া পড়ি, তখন আমরা বৌদ্ধ।

আচ্ছা, যে ভাবে তোমরা বাঙ্গালায় আসিয়াছিলে, সে ভাব ত্যাগ করিয়া এরূপ আধা-বৌদ্ধ আধা-হিন্দু ভাব লইলে কেন? তাহার কারণ এই যে, আমরা সংখ্যায় কম ছিলাম। পাঁচ জন বই ত আসি নাই। বল্লালের সময় ৪০০ ঘর মাত্র হইয়াছিলাম। আমরা রাজার সাহায্য পাইতাম, তা রাজা বৌদ্ধই হউন, আর হিন্দুই হউন। আমাদের সমাজও ছোট ছিল, যাহারা অবৌদ্ধ অথবা ব্রাহ্মণ-পক্ষ ছিল, তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিতাম। আমাদের একটি সমাজ ছিল। তাহার পর মুসলমান যখন দেশ অধিকার করিল, তখন আমরা রাজার সাহায্য হারাইলাম। আমাদিগকে মুসলমানদের অধীন হিন্দু প্রজাদের উপরই কেবল নির্ভর করিতে হইত। সুতরাং আমাদের দল বাড়াইবার চেষ্টা করিতে হইল। আমাদের সুবিধাও হইল। ভিক্ষুশূন্য বৌদ্ধসমাজ এক রকম বেওয়ারিশ মাল। যে যাহাকে পাবে, আপন দলভুক্ত করিতে লাগিল।

এ সকল ঘটনা বোধ হয়, ১২০০ হইতে ১৪০০ সাল, এই দুই শত বৎসরের মধ্যে হইয়াছিল। যাহারা প্রথম হিন্দুদলভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা ভাল ব্যবহার পাইয়াছিল। তাহাদিগকে 'নব শাখ' বলে অর্থাৎ নূতন শাখা। তাহার পর কায়স্থগণ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মান-সম্ভ্রম ও সামাজিক মর্য্যাদা ছিল। ব্রাহ্মণের দলে আসিয়া তাঁহারা সে মর্য্যাদা হারান নাই। কায়স্থদের কথা একটু বেশী করিয়া বলা ভাল। বাঙ্গালায় জমাজমী সম্বন্ধে কায়স্থগণের ক্ষমতা অসীম ছিল। ফরিদপুরের যে চারিখানি তাম্রশাসনকে রাখালবাবু জাল

বলিয়াছিলেন এবং পার্জিটর সাহেব যেগুলিকে প্রমাণ বলিয়াছিলেন, জাল নয়, সেগুলি খৃ ৫০০ হইতে ৬০০ এর মধ্যে লেখা। তাহাতে দেখা যায়, বৃদ্ধ কায়স্থ ও কায়স্থগণের অনুমতি ভিন্ন কেহ একটুকুও জমী গ্রামের মধ্যে পাইতে পারিত না। তেঙ্গুরে যে সকল সংস্কৃত পুস্তকের নাম আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি কায়স্থের রচিত। টঙ্কদাস নামে একজন বৃদ্ধ কায়স্থ তন্ত্রের পুথি লিখিয়াছেন। 'চাঙ্গুকারিকা'গুলি কায়স্থ বৌদ্ধ চাঙ্গুদাসের লেখা। চাঙ্গুকারিকার টীকাকার বলেন, কায়স্থদের ইষ্টদেবতা বুদ্ধ। সুতরাং কায়স্থদিগের মধ্যে অনেকে যে বৌদ্ধ ছিলেন, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। মুসলমান অধিকার হওয়ায় তাঁহাদের ক্ষমতা বাড়িয়াছিল বই কমে নাই। কারণ, দেশের জমীর হাট-হদ্দ তাঁহারাই জানিতেন। বৈষ্ণব-সাহিত্যে মাঝে মাঝে আছে,—"নেড়ে জব্দ কর্‌বি যদি কায়েৎ ডেকে আন্"। ১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত কায়স্থগণই বাঙ্গালায় বেশী পরাক্রমশালী হইয়াছিলেন। প্রথম, রাজা গণেশ, যিনি বাঙ্গালার সুলতান হইয়াছিলেন, তিনি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ, দিনাজপুরের রাজারা তাঁহারই দৌহিত্রবংশ। তাহার পর চৈতন্য-পরিবারের মধ্যে বাসু ঘোষ ও মাধব ঘোষ খুব প্রবল হইয়াছিলেন। সুবুদ্ধি গৌড়ের মুসলমান বাদশাহের ডান হাত ছিলেন। হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন সাতগাঁ দখল করিয়া লইয়া, সেখানকার রাজা হইয়াছিলেন। 'আইন-ই-আকবরী'তে লেখা আছে, কায়স্থরাই জমীদার, তাঁহাদের বিস্তর সৈন্য-সামন্ত ও হাতী ঘোড়া ছিল।

কিন্তু তখনও কায়স্থদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম চলিতেছিল। বেণুগ্রামে মিত্রদিগের বাড়ী তখনও বৌদ্ধধর্ম্মের বই নকল হইতেছিল। তখনও দেশে অনেক ভিক্ষু ছিল এবং যে বই নকল হইতেছিল, তাহা কোন বিশেষ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের বই নয়, একেবারে মহাযানের বই, মহাযানের মর্ম্ম বোধের বই। সে বইখানা ইংরাজী ১৪৩৬ সালে নকল করা হয়। এই সময়ে আরও বৌদ্ধ বই নকল হইয়াছিল, তাহার প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। কালচক্রযানের অতি শুদ্ধ বাঙ্গালা অক্ষরের একখানি বই কেম্ব্রিজে আছে। কলাপব্যাকরণের টীকা টিপ্পনী শুদ্ধ বই বৌদ্ধ মঠধারীর জন্য কপি করা হয়। সেখানি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে।

এই সকল দৃষ্টে বেশ জানা যায় যে, ১৪০০ হইতে ১৫০০ মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম এ দেশে চলিতেছিল এবং অনেক কায়স্থও বৌদ্ধ ছিলেন। চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লইয়া যে সকল বই লেখা হয়, তাহাতে বৌদ্ধদের বাঙ্গালায় থাকার কথা নাই। চৈতন্যদেব নিজে দক্ষিণদেশে বৌদ্ধ দেখিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ তাঁহাদের হিমালয়ের মধ্যে দেখিয়াছিলেন। কেবল চূড়ামণিদাস বলিয়াছিলেন যে, চৈতন্যদেব জন্ম গ্রহণ করায় বৌদ্ধেরা খুব আনন্দিত হইয়াছিল। এই সকল বই যদিও চৈতন্যের জীবনের ঘটনা লইয়া লেখা, তথাপি এগুলি ১৫৫০ হইতে ১৬০০ মধ্যে লেখা হইয়াছিল।

১৫০০ হইতে ১৬০০ মধ্যে নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্যদিগের অভ্যুত্থান। বাসুদেব সার্ব্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, টীকাকার মথুরানাথ, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, গোবিন্দ কবিকঙ্কণাচার্য্য, শ্রীকর, শ্রীনাথ, রঘুনন্দন—এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং বাঙ্গালায় ন্যায় ও স্মৃতির প্রচার করেন। স্মৃতির প্রচার মানে সমাজ বাঁধা। ইহাঁদের পুস্তকে বৌদ্ধদের নাম বড় একটা নাই, কিন্তু ইহাঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিকার শূলপাণি লিখিয়াছেন—বৌদ্ধ দেখিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। বৌদ্ধ যদি দেশে অধিক থাকিত, তাহা হইলে এই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে

হইত। যে দিকেই হউক, ১৫০০ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত এই এক শত বৎসরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধদের নাম লোপ হয়, আর ব্রাহ্মণেরা সমস্ত দেশটাকে হিন্দু করিয়া তুলেন। এই সময় হইতেই কায়স্থ মহাশয়েরা অবচ্ছেদাবচ্ছেদে হয় শাক্ত অথবা বৈষ্ণব হন অর্থাৎ হিন্দু হন এবং সমাজ শাসনে ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র সহায় হন। রাব ভূক্রিয়ার মধ্যে যে কয়জন কায়স্থ ছিলেন, সবাই হিন্দু এবং ব্রাহ্মণদিগের কথামত সমাজ শাসন করিতেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুপ্ত উপাধিধারী লোকেরাই বৌদ্ধদিগের জন্য স্মৃতির বই লিখিতেন, পূজা আদির বই লিখিতেন, ব্যবস্থার বই লিখিতেন, দীক্ষার বই লিখিতেন। কিন্তু তখন তাঁহাদের উপর ভিক্ষুরা ছিল। ভিক্ষুরা মারা গেলে বা পলাইয়া গেলে তাঁহারাই বৌদ্ধধর্ম্মের কর্ত্তা হইলেন। কিন্তু কিরূপে তাঁহারা আপনাদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস এখনও পাওয়া যায় নাই। তবে চৈতন্যদেবের সময় অনেক গুপ্ত ও তাঁহাদের কুটুম্ব বৈদ্যগণ চৈতন্যদেবের ধর্ম্ম আশ্রয় করেন, ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধে বই লেখেন এবং তাঁহাদের বংশধরেরা এখনও গুরুগিরি করিতেছেন।

১৪০০ হইতে ১৬০০ পর্য্যন্ত যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের মায়া কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, ধনের গৌরবে, পদমর্য্যাদার গৌরবে, বিদ্যার গৌরবে বা অন্য কোনও কারণে বৌদ্ধধর্ম্মেই লাগিয়া ছিলেন, নবদ্বীপের ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরা তাঁহাদিগকে অনাচরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। চৈতন্যদেব তাঁহাদের হিন্দু করিলেও, নিত্যানন্দদেব তাঁহাদের মন্ত্র দিলেও তাঁহারা অনাচরণীয় হইয়াই রহিয়াছেন। তাহার পর তাঁহারা ব্রাহ্মণ লইয়াছেন। কবিকঙ্কণ লিখিয়া গিয়াছেন, 'বর্ণবিপ্র হয় মঠধারী' অর্থাৎ অনাচরণীয় জাতিগণের যাঁহারা বিপ্র হইয়াছেন, তাঁহারা মঠধারী অর্থাৎ ভিক্ষু। আমরা পূর্ব্বপুরুষদের নিকট শুনিয়াছি যে, এই সকল ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন, ইঁহাদের গলায় পৈতা দেওয়া হইয়াছিল মাত্র। তাহার পর রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা অনেক সময় জীবিকার আশায়, অনেক সময়ে অন্য কারণে বর্ণের ব্রাহ্মণ হইয়াছেন এবং আপনাদের পূর্ব্ব গাঞা গোত্র উল্লেখ করিয়া থাকেন। এই সকল পতিত বলিয়া পরিচিত ব্রাহ্মণদের গোড়া খুঁজিতে গেলে ৯ বা ১০ পুরুষের বেশী পাওয়া যায় না। তাঁহাদের পূর্ব্বে বর্ণের যে সব ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা "মঠধারী"। কিন্তু এই সকল ব্রাহ্মণকে বাধ্য হইয়া মঠধারীদের সহিত বিবাহাদি করিতে হইত, সুতরাং ইঁহারা এখন এক একটি স্বতন্ত্র জাতি হইয়া উঠিয়াছেন। বর্ণব্রাহ্মণদের একটু বিশেষত্ব এই যে, এক বর্ণের ব্রাহ্মণ অন্য বর্ণের ব্রাহ্মণকে অনাচরণীয় মনে করেন। তাঁহারা যদি এক হইয়া বসেন, তাহা হইলে আমরা একেবারে মারা যাইব। কারণ, তাঁহাদের সংখ্যা অনেক বেশী। কিন্তু তাঁহারা তাহা করিতে রাজী নহেন। কেন নহেন, তাহার মূলতত্ত্ব একটি প্রধান বিসার্চের কথা। ঐ মূল কথাটি বাহির হইলে সমাজ সংস্কারের যে ঢেউ উঠিয়াছে, উহার অনেক সমাধা হইবে এবং জোরে সংস্কার চলিতে পারিবে।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী*

এককালে জগতের অনেকানেক সভ্য জাতির মধ্যে বর্ণমালা সহায়ে সংখ্যা লিখিবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল দেখা যায়। হিন্দু, গ্রীক, ইহুদি, আরব প্রভৃতি সকল জাতিই ঐ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং হিন্দু ব্যতীত অপর জাতির মধ্যে তাহার বিশেষ প্রচলন ছিল দেখা যায়। টীকাকার মক্কিভট্ট[1] তাহাকে 'অক্ষর-সংখ্যা' নামে উল্লেখ করিয়াছেন। আমরাও সেই নাম স্বীকার করিয়া লইলাম। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি।

হিন্দুপ্রণালী—আর্য্যভট

ভারতবর্ষে এককালে অক্ষর-সংখ্যার একাধিক প্রণালী প্রচলিত ছিল। তাহার একটি ৪৯৯ খ্রীষ্ট সালে সুপ্রসিদ্ধ গণিতাচার্য্য আর্য্যভট কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়। ৪৭৬ সালে কুসুমপুরী নগরীতে (অপর নাম পাটলীপুত্র, বর্ত্তমান পাটনা) আর্য্যভট জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ২৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্য্যভটীয়' প্রণয়ন করেন। তাঁহার অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর বিবরণ সেই গ্রন্থে পাওয়া যায়[2]। ঐ প্রণালীতে সর্ব্বসমেত বিয়াল্লিশটি অক্ষর প্রযুক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে তেত্রিশটী ব্যঞ্জনবর্ণ, বাকী নয়টি স্বরবর্ণ। স্বরবর্ণগুলি এই,—অ, ই, উ, ঋ, ৯, এ, ঐ, ও, ঔ। আ, ঈ, ঊ, ৠ, ৡ—এই দীর্ঘ-স্বরবর্ণ সাধারণতঃ আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে ব্যবহৃত হয় না। কখন হইলেও তাহারা তত্তৎ হ্রস্ব-স্বরবর্ণেরই সমশক্তিক বলিয়া ধরা হয়। প্রসঙ্গক্রমে এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বর্ণমালা নির্ব্বাচন বিষয়ে আর্য্যভট 'শিবসূত্রে'র অনুসরণ করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের মতে বর্ণমালায় মোট বিয়াল্লিশটি অক্ষর—তেত্রিশটি ব্যঞ্জন ও নয়টি স্বর। বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ পাণিনিও 'শিবসূত্রে'র অনুসরণ করিয়াছেন। 'শিক্ষা' ও 'বেদপ্রাতিশাখ্য' প্রভৃতির মতে বর্ণমালায় অক্ষরের সংখ্যা অনেক বেশী। কাহারো কাহারো মতে অক্ষর ৬০ হইতে ৬১টি।

আর্য্যভটের মতে অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের অঙ্কখ্যাপন-শক্তি নিম্ন প্রকার[3]।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্	চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্
		য্	র	ল	ব্	শ্	ষ্	স	হ্
১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্	ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
২১	২২	২৩	২৪	২৫					
প্	ফ্	ব	ভ্	ম্					

---

* ১৩৩০। ৫ই ফাল্গুন তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে লেখক কর্ত্তৃক পঠিত।

১। ইনি শ্রীপতিকৃত 'সিদ্ধান্তশেখর' নামে বৃহৎ জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করিয়াছেন। মক্কিভট্ট ১৩৭৭ খ্রীষ্টীয় সালে জীবিত ছিলেন। শ্রীপতি ১০৩৯ সালের লোক।

২। 'আর্য্যভটীয়', গীতিকাপাদ, ২ শ্লোক।

৩। বাঙ্গালা বর্ণমালায় বর্গীয় ব-কারে ও অবর্গীয় ব-কারে কোন ভেদ নাই। দেবনাগর বর্ণমালায় তাহাদের ভেদ আছে। সেই ভেদ বজায় রাখিবার জন্য আমরা অক্ষর-সংখ্যায় বর্গীয় ব কারকে 'ব' এইরূপে লিখিলাম।

আর্য্যভটের প্রণালীতে অসম্পৃক্ত স্বরবর্ণ কোন সংখ্যা খ্যাপন করে না। কিন্তু তাহারা অঙ্কস্থান নির্দ্দেশ করে, অর্থাৎ কোন ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলে তাহারা নির্দ্দেশ করিয়া দেয় যে, সেই ব্যঞ্জন-বোধিত অঙ্কটি কোন্ অঙ্কস্থানে বসিবে। স্মরণাতীত কাল হইতে হিন্দু গণনাশাস্ত্রে একক, দশক হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত আঠারটি অঙ্কস্থান স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। আর্য্যভট তাহাদিগকে দুই দুই করিয়া নয় যুগলে ভাগ করেন। পরে অ, ই, ক্রমে স্বরবর্ণের দ্বারা তাহাদের চিহ্নিত করেন। যথা,—

ঌ		ঋ		উ		ই		অ	
বৃন্দ	অর্ব্বুদ	কোটি	নিযুত	লক্ষ	অযুত	সহস্রক	শতক	দশক	একক

ঔ		ও		ঐ		এ	
পরার্দ্ধ	মধ্য	অন্ত্য	সমুদ্র	শঙ্খ	মহাপদ্ম	নিখর্ব্ব	খর্ব্ব

কোন ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পৃক্ত হইলে স্বরবর্ণটি তাহাকে স্বীয় যুগলে টানিয়া নেয়। কিন্তু ঐ যুগলের কোন্ স্থানে সেই ব্যঞ্জন-বোধিত অঙ্কটি স্থাপন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য আর্য্যভট আর এক প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি অঙ্কস্থানকে 'বর্গ' ও 'অবর্গ' এই দুই সংজ্ঞার দ্বারা বিশেষিত করিয়াছেন। একক, শতক, অযুত প্রভৃতি বর্গস্থান, আর দশক, সহস্রক, লক্ষ প্রভৃতি অবর্গস্থান। ফ্লীট প্রমুখ কেহ কেহ মনে করেন যে, একক, শতক প্রভৃতি স্থানের 'বর্গ' সংজ্ঞা করার কারণ এই যে, তাহাদিগকে বর্গরূপে প্রকাশ করা যায়। যথা,—

একক $= ১^২$, শতক $= ১০^২$, অযুত $= ১০০^২$, ইত্যাদি।

বর্ণমালার বর্গাবর্গ বিভাগ দেখিয়াও আর্য্যভট অঙ্কস্থানের ঐ প্রকার বিভাগ কল্পনা করিয়া থাকিতে পারেন। বর্ণমালার আদ্যক্ষর বর্গ, সুতরাং অঙ্কের ও আদ্যস্থানের বর্গ সংজ্ঞা করা উচিত। আর্য্যভট বলিয়াছেন, ঙ্-বোধিত অঙ্ক ও ম্-বোধিত অঙ্ক একত্রে য-বোধিত অঙ্কের সমান। অসম্পৃক্ত য্ ৩ অঙ্ক খ্যাপন করে; সুতরাং অ-যুগলের দশক স্থানে বসিলেই অকারসম্পৃক্ত য্ ৩০ সংখ্যা খ্যাপন করিতে পারে। য্ অবর্গাক্ষর, সুতরাং দশক স্থানেরও অবর্গ সংজ্ঞা হওয়া উচিত। হয়ত এই প্রকার বিচার করিয়াই আর্য্যভট অঙ্কস্থানগুলির বর্গ ও অবর্গরূপে ভেদ করিয়া থাকিবেন। সে যাহা হউক, এই প্রকারের বিভাগ-করণের ফলে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক যুগলেই একটি বর্গস্থান আর একটি অবর্গস্থান আছে। আর্য্যভট বলেন যে, বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণ একমাত্র বর্গ-সংজ্ঞিত অঙ্কস্থানে অবস্থান করিতে পারিবে এবং অবর্গ ব্যঞ্জনবর্ণ একমাত্র অবর্গ-সংজ্ঞিত অঙ্কস্থানে বসিতে পারিবে, কিছুতেই ইহার অন্যথা হইতে পারিবে না। সুতরাং স্বরসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটি যদি বর্গীয় হয়, তাহা অর্থাৎ তদ্বোধিত অঙ্ক স্বরনির্দ্দিষ্ট যুগলের বর্গস্থানে বসিবে। আর যদি অবর্গীয় হয়, তবে তাহা ঐ যুগলের অবর্গস্থানে বসিবে। যথা,—'গু', গ্ বর্গীয় ব্যঞ্জন, তাই উ সম্পৃক্ত হওয়াতে তদ্বোধিত অঙ্ক ৩কে উ-যুগলের বর্গস্থানে অর্থাৎ অযুত অঙ্ক স্থানে বসাইতে হইবে। আর্য্যভট লিখিয়াছেন,—"শূন্যোপলক্ষিত আঠার স্থান।" অর্থাৎ তিনি

কল্পনা করেন যে, আঠার অঙ্কস্থানের প্রত্যেকটাই শূন্য। কোন স্থানে কোন অঙ্ক রাখিলে মাত্র সেই স্থানই পূর্ণ হইল, অপরগুলি তখনও শূন্য থাকিবে। অঙ্কপাত কালে তাহা শূন্যচিহ্ন (০) দ্বারা বিশেষ করিয়া দেখাইতে হয়। এই প্রকারে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, 'গু' = ৩০,০০০। কিন্তু যদিও য্ = ৩ = গ্, 'যু' = ৩০০,০০০। কারণ, য্ অবর্গীয় ব্যঞ্জন। তাই উ বর্ণ তদ্‌খ্যাপিত অঙ্ক ৩কে উ-যুগলের অবর্গ স্থানে, অর্থাৎ লক্ষ স্থানে নিয়া বসাইবে। কোন সংযুক্ত বর্ণ অর্থাৎ দুইটি ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত হইয়া যদি একই স্ববর্ণ-সম্পৃক্ত হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, উভয় ব্যঞ্জনই ঐ স্বরনির্দ্দেশিত যুগলে স্থান পাইবে। আর্য্যভট বলেন যে, এক মহাযুগে সূর্য্যের ভগণ 'খ্যুঘৃ'। ইহাতে ঘ্ খ্যাপিত অঙ্ক (৪ ঋ-যুগলে বসিবে। ঘ বর্গীয় বর্ণ, ঋ-যুগলের বর্গস্থান নিযুত। সুতরাং ৪কে নিযুত স্থানে রাখিতে হইবে। খ্ (= ২) ও য্ (= ৩) উভয়ে উ-যুগলে যাইবে। খ্ বর্গীয় বর্ণ, উ-যুগলের বর্গস্থান অযুত, সুতরাং ২কে অযুত স্থানে বসাইতে হইবে। য্ অবর্গীয় বর্ণ, উ-যুগলের অবর্গ-স্থান লক্ষ, সুতরাং ৩কে লক্ষস্থানে রাখিতে হইবে।

ঋ		উ		ই		অ	
কোটি	নিযুত	লক্ষ	অযুত	সহস্রক	শতক	দশক	একক
	ঘ্	য্	খ্				
	‖	‖	‖				
	৪	৩	২				

এইরূপে পাওয়া যায় – 'খ্যুঘৃ' = ৪,৩২০,০০০। যদি কোন বর্ণ দ্বিস্থানাঙ্ক খ্যাপন করে, যেমন দ্ = ১৮, তবে তাহা স্বস্থানে ও স্বোপরিস্থানে স্থাপয়িতব্য। যথা, আর্য্যভটের মতে পৃথিবীর ব্যাস 'ঞিলা'। এই স্থলে ঞ্ বর্গীয় বর্ণ। সুতরাং তৎখ্যাপিত অঙ্ক ১০ ই-যুগলের বর্গস্থানে রাখিতে হইবে। কিন্তু ১০ দ্বিস্থানাঙ্ক। তাহাকে শতক-স্থানে রাখিতে গেলে ১ উপরিবর্ত্তী সহস্রক স্থানে গিয়া পড়িবে। ল্ দশক-স্থানে বসিবে।

ই		অ	
সহস্রক	শতক	দশক	একক
	ঞ্	ল্	
	‖	‖	
১—	০	৫	

অতএব 'ঞিলা' = ১০৫০। আর্য্যভট বলেন যে, এক মহাযুগে চন্দ্রপাতের ভগণ 'বৃফিনচ'।

উ		ই		অ	
লক্ষ	অযুত	সহস্রক	শতক	দশক	একক
	ব্		ফ্		ন্ চ্
	‖		‖		‖ ‖
২—	৩	২—	২	২—	০ ৬

সুতরাং 'বৃফিনচ' = ২৩২২২৬।

আর্য্যভট প্রণালীর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা

কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী এই প্রকারের[১]—

ক=১	চ=৬	ট=১১	ত=১৬	প=২১	য=৩০	
খ=২	ছ=৭	ঠ=১২	থ=১৭	ফ=২২	র=৪০	ষ=৮০
গ=৩	জ=৮	ড=১৩	দ=১৮	ব=২৩	ল=৫০	স=৯০
ঘ=৪	ঝ=৯	ঢ=১৪	ধ=১৯	ভ=২৪	ব=৬০	হ=১০০
ঙ=৫	ঞ=১০	ণ=১৫	ন=২০	ম=২৫	শ=৭০	

অ=১	এ=১০০০০০০০০০০
ই=১০০	ঐ=১০০০০০০০০০০০০
উ=১০০০০	ও=১০০০০০০০০০০০০০০
ঋ=১০০০০০০	ঔ=১০০০০০০০০০০০০০০০০
ঌ=১০০০০০০০০	

এই প্রকারের ব্যাখ্যায়ও কাজ চলে। তাহাতেও আর্য্যভট-প্রদত্ত ভগণাদি ঠিক ঠিক অঙ্কে পাত করা যায়। যথা,—

'খ্যুঘৃ' = (খ + য) × উ + ঘ × ঋ

= (২ + ৩০) × ১০০০০ + ৪ × ১০০০০০০

= ৪,৩২০,০০০

কিন্তু উদ্ভাবয়িতার অভীপ্সিত তত্ত্ব যে, ঐ প্রকারের নহে, তাহা সহজেই প্রমাণ করা যায়। আর্য্যভট অঙ্কস্থানগুলিকে বর্গ ও অবর্গ হিসাবে ভাগ করিয়াছেন। আরো বলিয়াছেন যে, "বর্গাক্ষর বর্গস্থানে ও অবর্গাক্ষর অবর্গস্থানে বসিবেক।" শেষোক্ত ব্যাখ্যা সত্য হইলে এই বাক্য সম্পূর্ণ নিরর্থক হয়। কারণ, তাহাতে বর্ণের ও অঙ্কস্থানের বর্গাবর্গ বিচারের কোন প্রয়োজন হয় না।

১। অনেক খ্যাতনামা লেখকও আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর ব্যাখ্যা করিতে গিয়া এই ভুল করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে কয়েক জনের নামোল্লেখ করিতেছি —শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ১৮৯৬, ১২১ পৃষ্ঠা। সুধাকর দ্বিবেদী, 'গণক-তরঙ্গিণী।' শ্রীগৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা, 'ভারতীয় প্রাচীন লিপিমালা', ২য় সংস্করণ, ১৯১৮।

C. M. Whish, "On the Alphabetic Notation of the Hindus", *Transaction of the Literary Society of Madras* Part I, 1827, pp. 55 ff This paper was translated into French by E. Jacquet and published in the *Journal Asiatique*, 1835

L Rodet, "Sur la veritable significance de la Notation Numerique inventee par Aryabhata", *Journal Asiatique*, 1880, Part II, pp. 440 ff.

M. Cantor, *Geschichte der Mathematik*, Bd. I, Leipzig, 1907, p, 606.

G. R. Kaye—"Notes on Indian Mathematics—Arithmetical Notation"; *Journal Asiat. Soc. Beng*, Vol. III, 1907, p. 478, *Indian Mathematics*, Calcutta, 1915, p. 30; *The Bakhshali Manuscript*, Calcutta, 1927 p. 81,

শ্রীনরেন্দ্রকুমার মজুমদার, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২৫ বঙ্গাব্দ, ২০২ পৃষ্ঠা, পাদটীকা।

এই ব্যাখ্যার আরো একটী দোষ আছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, অকারসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণই সংখ্যাজ্ঞাপন করে। কিন্তু তাহা ভুল। কারণ, অপর কোন স্বরবর্ণের সহিত যোগ করিতে গেলে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহা অযাচিতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে ; যথা— য+ই='যে' হইবে, 'যি' হইতে পারে না ; গ+ঋ='গৃ' হইতে পারে না, 'গর্' হইবে। ঐ প্রকারে ইষ্ট সংখ্যা লেখা যাইতে পারে না। সেই হেতু বলিতে হইবে যে, ব্যাকরণের নিয়ম অক্ষরসংখ্যার বেলায় খাটিবে না, অথবা মানিতে হইবে যে, কেবল অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনই সংখ্যা খ্যাপন করে। সুতরাং তখন বলিতে হইবে যে, য্=৩০, র্=৪০, ইত্যাদি। এই করিলে আবার অপর বিরোধ উপস্থিত হইবে।

এই সকল কারণ হেতু স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্য্যভটের অক্ষর সংখ্যা-প্রণালীর উপরোক্ত ব্যাখ্যা ভ্রান্ত।

বার্ণেল আর এক প্রকার ভুল করিয়াছেন[১]। তিনি বলেন যে, আর্য্যভটের প্রণালীতে অ=১, আ=১০, ই=১০০০, ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে আর্য্যভট হ্রস্ব স্বরে ও দীর্ঘ স্বরে কোন প্রকার ভেদ করেন নাই। তাঁহার অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে অকার ও আকার, ইকার ও ঈকার প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকারে সমশক্তিক।

আর্য্যভটের শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যা

আর্য্যভট যে শ্লোকে আপনার অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর বিবৃতি দিয়াছেন, তাহা এই,—

"বর্গাক্ষরাণি বর্গেঽবর্গেঽবর্গাক্ষরাণি কাৎ ঙ্মৌ যঃ।
খ দ্বিনবকে স্বরা নব বর্গেঽবর্গে নবান্ত্যবর্গে বা॥"

"ক্ হইতে বর্গাক্ষর বর্গ (স্থানে), (য হইতে) অবর্গাক্ষর অবর্গ (স্থানে বসিবে, যাহাতে) ঙ্ ও ম্ মিলিয়া য (হইতে পারে)। নয় বর্গ ও নয় অবর্গ (মিলিয়া) শূন্যোপলক্ষিত আঠার স্থানে স্বরবর্ণ (থাকিবে)। পরবর্ত্তী স্থানসমূহেও সেই প্রকার।" আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী বিষয়ে যে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা যে কত ভ্রান্ত, তাহা আর্য্যভটের মূল শ্লোক দেখিয়া সহজে বোধগম্য হইবে। তাঁহার প্রাচীন টীকাকারগণের প্রদত্ত ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়া, তাহা আমরা আরো বিশেষ করিয়া প্রমাণ করিয়া দিব।

প্রাচীন টীকাকারের ব্যাখ্যা

'আর্য্যভটীয়' গ্রন্থের একাধিক টীকা ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়[২]। কিন্তু তাহার সকলগুলি এখন পাওয়া যায় না। আমরা দুখানি টীকা দেখিয়াছি। একখানি সূর্য্যদেব যজ্বা প্রণীত, নাম 'ভটপ্রকাশিকা'। অপরখানি পরমেশ্বরকৃত, নাম 'ভটদীপিকা'। পরমেশ্বর খৃষ্টীয় ১৪৩০ সালের কাছাকাছি সময়ে জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

১। A. C. Burnell, *Elements of South Indian Palæography*, 2nd edition, London, 1878, p 62

২। Vide Bibhutibhusan Datta, "Aryabhata, the author of the *Ganita*", *Bull. Cal. Math. Soc.*, XVIII, 1927, pp. 5—18.

সূর্য্যদেব যজ্বার জীবিতকাল এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। তিনি যে পরমেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, পরমেশ্বর তাঁহার টীকায় স্থানে স্থানে 'ভটপ্রকাশিকা'র মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। আমার মনে হয়, সূর্য্যদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতকে জীবিত ছিলেন।

য-কার-বোধিত সংখ্যা সম্বন্ধে সূর্য্যদেব বলেন,—"বর্গস্থানাপেক্ষয়া ত্রিংশৎসংখ্যো যকারঃ, স্বস্থানাপেক্ষয়া ত্রিসংখ্যঃ। এবং যকারস্য ত্রিত্ববিধানাৎ তদুত্তরেষাং রেফাদীনাং তু চতুরাদিসংখ্যাত্বং সিদ্ধং। তেন রেফঃ চতুঃসংখ্যঃ লকারঃ পঞ্চসংখ্যঃ ইত্যাদ্যবগন্তব্যম্।"

অর্থাৎ "বর্গস্থানাপেক্ষায় য-কার ৩০ সংখ্যা (খ্যাপন করে)। কিন্তু স্বস্থানাপেক্ষায় ৩ সংখ্যা। এইরূপে য্-কার ৩ বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়াতে র্-কারাদিরও ৪ প্রভৃতি সংখ্যাত্ব সিদ্ধ হইল। সেই হেতু র্ = ৪, ল্ = ৫, এই প্রকার বুঝিতে হইবে।" পরমেশ্বরও এই প্রকারই বলিয়াছেন,—"অত্র প্রথমস্থানমঙ্গীকৃত্য ত্রিংশদিত্যুক্তং নতু দ্বিতীয়স্থানমঙ্গীকৃত্য। দ্বিতীয়স্থানে হি ত্রিসংখ্যো যকারঃ। ইত্যুক্তং ভবতি। রেফাদয়ঃ ক্রমেণ দ্বিতীয়স্থানে চতুরাদি-সংখ্যাঃ স্যুঃ।"

স্বরবর্ণ বিষয়ে পরমেশ্বর স্পষ্টতই বলিয়াছেন,—"এতদুক্তং ভবতি ককারাদ্যক্ষরগতাঃ স্বরাঃ স্থানপ্রদর্শকা ভবন্তি ন সংখ্যাবিশেষপ্রদর্শকা ইতি" অর্থাৎ "ইহা বলা হয় যে, স্বরবর্ণ ককারাদি অক্ষরের স্থানপ্রদর্শক হয়, সংখ্যাবিশেষপ্রদর্শক হয় না ইতি"। সূর্য্যদেব এইরূপ স্পষ্ট বাক্যে না বলিলেও তিনি দেখাইয়াছেন যে, কি করিয়া নয়টি স্বরবর্ণ অষ্টাদশ স্থানকে প্রদর্শন করিতে পারে। অতঃপর আর সংশয় থাকিতে পারে না যে, আর্য্যভটের অক্ষর-প্রণালী বিষয়ে প্রথমোল্লিখিত ব্যাখ্যাই আবিষ্কর্ত্তার অভীপ্সিত ও তাঁহার টীকাকার-গণের অনুমোদিত। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা কার্য্যকরী হইলেও প্রকৃত নহে।

ফ্লীটের মতের সমালোচনা

সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ আধুনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে ফ্লীটই, বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে, আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর প্রকৃতার্থ ধরিতে পারিয়াছিলেন[১]। তিনি সত্যই বুঝিয়াছিলেন যে, আর্য্যভটের মতে স্বরবর্ণের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি নাই, তাহারা অঙ্কস্থাননির্দ্দেশক মাত্র। কিন্তু তিনি দুএকটা ভুল করিয়াছেন। ফ্লীট আর্য্যভটের শ্লোকের শেষ চরণের অর্থ বুঝেন নাই। তিনি মনে করেন যে, "নবান্ত্যবর্গে বা" পদে আর্য্যভট হয় ত পরার্দ্ধের পরে এক ঊনবিংশতিতম স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত ও পর্য্যটক আলবিরুণী লিখিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুদের গণনাপদ্ধতিতে 'ভূরি' নামে এক ঊনবিংশতিতম স্থান আছে[২]। ইহা সত্য নহে। সে যাহা হউক, ফ্লীট স্বকৃত ব্যাখ্যার সমর্থনকল্পে উহারই উল্লেখ করিয়াছেন। এবং বলেন যে, ঐ স্থান বৃন্দসংখ্যার বর্গতুল্য বলিয়া তাহাকে বর্গস্থান

১। J. F. Fleet, "Aryabhata's system of expressing numbers". J R A.S., 1911, pp. 109 ff. অধ্যাপক শ্রীসারদাকান্ত গাঙ্গুলী ও পণ্ডিত শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ীও আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর প্রকৃতার্থ করিয়াছেন। ইঁহাদের লেখার উল্লেখ পরে করা যাইবে।

২। *Alberuni's India*, trans. by E. C. Sachau, 2nd ed., London, 1910, vol I, p. 175.

বলা হইয়াছে। এই প্রকারে তিনি ঐ শ্লোকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির অর্থ করেন যে,—"নয়টি স্বরবর্ণ বর্গ ও অবর্গ দ্বিনবক স্থানে ও নয়ের ঠিক পরবর্ত্তী বর্গস্থানে (ব্যবহৃত হইবে);" অধ্যাপক শ্রীসারদাকান্ত গাঙ্গুলি ফ্লীটের ব্যাখ্যার ভুল প্রদর্শন করিয়াছেন১। মাত্র এক স্থানে কি প্রকারে নয়টি স্বরবর্ণ রাখা যায়? আমরা আর্য্যভটের টীকাকারগণের অনুসরণ করিয়া ঐ স্থলের প্রকৃতার্থ নির্ণয় করিতেছি। তাঁহারা বলেন যে, পরার্দ্ধ হইতেও বৃহৎ সংখ্যা নির্দ্দেশের সঙ্কেত আর্য্যভট ঐ পদে করিয়াছেন। প্রথম অষ্টাদশ স্থানের ন্যায় দ্বিতীয় অষ্টাদশ স্থানকেও বর্গাবর্গ হিসাবে নয় যুগলে ভাগ করিয়া, অনুস্বার বা বিসর্গযুক্ত করিয়া নয়টি স্বরবর্ণের দ্বারা তাহাদের নির্দ্দেশ করিতে হইবে২।

ফ্লীটের দ্বিতীয় প্রমাদ এইখানে। তিনি বলেন, "কি ব্যঞ্জনবর্ণ, কি স্বরবর্ণ, একাকী কেহ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারে না। উভয়ে সম্পৃক্ত হইলেই সংখ্যাজ্ঞাপন করিতে পারে।" ইহা সত্য নহে। অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনের যে সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি আছে, তাহা টীকাকারগণের কথাতেই বোঝা যায়। তাঁহারা একবাক্যে বলিয়াছেন,—যকার, রকারাদি সম্পৃক্তাবস্থায় ৩০, ৪০ প্রভৃতি সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। কিন্তু অসম্পৃক্ত অবস্থায় ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। আর্য্যভটের মূল শ্লোকেও ইহার প্রমাণ আছে। তিনি লিখিয়াছেন,— "ঙ্মৌ যঃ"। এখানে "ঙমৌ" পাঠ করিলে ছন্দোভঙ্গ হয়। "ঙ্মৌ" পাঠই শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, অসম্পৃক্ত ঙ কার দ্বারা আর্য্যভট ৫ সংখ্যা খ্যাপন করিয়াছেন।

ফ্লীট মনে করিতেন যে, আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে গ্রীক অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর প্রভাব আছে। গাঙ্গুলী মহাশয় তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা তাহার উল্লেখ পরে করিব।

কে'র মত খণ্ডন

আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর ব্যাখ্যা বিষয়ে কে' যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। অধুনা তাঁহার আরো দুইটা ভ্রান্ত মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করা যাইতেছে। কে বলেন যে,—(১) আর্য্যভট তাঁহার অক্ষরসংখ্যা-নির্দ্দেশক বাক্যে ছোট সংখ্যাটি বৃহৎ সংখ্যার বামে রাখিতেন; (২) আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে

১। Sarada Kanta Ganguly, "Was Aryabhata indebted to the Greeks for his alphabetic system of expressing numbers," *Bull. Cal. Math. Soc.*, vol. xvii, pp. 195 ff.

২। সূর্য্যদেব বলেন,—"যথা পুনস্তদধিকপ্রতিপাদ্যসংখ্যা কস্যচিৎ বিবক্ষিতা ভবতি তদা কথং কর্ত্তব্যঃ। তত্রাহ 'নবান্ত্যবর্গে বা'।...তত্রৈবা স্বস্তিকারঃ প্রথমাষ্টাদশে শুদ্ধঃ প্রযুক্তঃ স দ্বিতীয়াষ্টাদশকে প্রথমবর্গাবর্গয়োরনুস্বারাদিযুক্তঃ প্রযোক্তব্যঃ, কং খং, যং, রং ইত্যেবং দ্বিতীয়বর্গাবর্গেষু হকারাদয়োঽপ্যনুস্বারোপযুক্তাঃ প্রযোক্তব্যাঃ, এবং তৃতীয়াষ্টাদশকে অন্যদুপলক্ষণং কর্ত্তব্যং, এবং যাবদিষ্টং যদন্তদন্তদুপলক্ষণং কৃত্বা সংখ্যোপদেষ্টব্যা।"

পরমেশ্বর বলেন,—"যদা পুনস্ততোঽধিকাপি সংখ্যা কেনচিদ্বিবক্ষিতা তদা কথমিত্যত্রাহ 'নবান্ত্যবর্গে বা' ইতি। নবানাং বর্গস্থানানামন্ত্যে ঊর্দ্ধগতে বর্গস্থাননবকে তথা নবানামবর্গস্থানানামন্ত্যে ঊর্দ্ধগতে অবর্গস্থাননবকে চ এতে নব স্বরাঃ প্রযুজ্যন্তে বা। কেনচিদনুস্বারাদিবিশেষেণ সংযুক্তাঃ প্রযোজ্যা ইত্যর্থঃ।"

স্থানীয়-মানতত্ত্বের কোন পরিচিহ্ন নাই[১]। ইহার কোনটাই ঠিক নহে। প্রথমোল্লিখিত মত বস্তুতপক্ষে অপ্রণিধানতা জনিত। আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত যে দুইটী সংখ্যা-বাক্যের বিচার তিনি করিয়াছেন, 'খ্যুঘৃ' ও 'চয়গিয়িঙুশুছ্‌লৃ' তাহাদের দুইটাতেই স্বরবর্ণ শ্রেণীর নিম্নতন স্বর উর্দ্ধতন স্বরের বামে রহিয়াছে বটে। কিন্তু আর্য্যভটের ব্যবহৃত অপরাপর সংখ্যাবাক্যের প্রতি প্রণিধান করিয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, সর্ব্বত্র ঐ ক্রম অনুসৃত হয় নাই। উদাহরণ স্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, 'ঙুষ্‌খিধ', 'বুফিনচ' ও 'ঢুঙিখ্‌ঘ্ব' প্রভৃতি সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে স্বরসংস্থানক্রম কে'র কথিত ক্রমের সম্পূর্ণ বিপরীত। আবার 'খিচ্যুভ' ও 'সুগুশিথৃন'তে কোন প্রকারের বিশিষ্ট ক্রম নাই। প্রকৃতপক্ষে আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীমতে সংখ্যা প্রকাশ করিতে গিয়া স্বরসংস্থান বিষয়ে কোন বিশিষ্ট ক্রমের অনুসরণ করার আবশ্যকও নাই। ইহাতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, স্থানীয়-মানতত্ত্বের অবতারণা নাই বলিয়া, কে আর্য্যভট প্রণালীর প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা বুঝি সত্য। হিন্দু-দশমিক-প্রণালী মতে লিখিত সংখ্যায় কোন অঙ্কচিহ্ন স্থান পরিবর্ত্তন করিলেই সংখ্যাটি বিকৃত হইয়া যায়। কিন্তু আর্য্যভটপ্রণালীতে লিখিত সংখ্যাবাক্যে এক একটি ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরসম্পৃক্ত থাকিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিলেও ঐ বাক্যের সংখ্যাখ্যাপন-শক্তি অবিকৃত থাকিয়া যায়। যথা—'গকি' ও 'কিগ' একই সংখ্যা নির্দ্দেশ করিবে। কিন্তু ২৩ ও ৩২ এক নহে। কিন্তু আরো বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে বোধগম্য হইবে যে, আর্য্যভটের সংখ্যা-প্রণালীতেও একপ্রকারের স্থানীয়-মান আছে। প্রকৃতপক্ষে স্থানীয়-মানের মূলতত্ত্বের উপরই তাহা সম্যক্ প্রতিস্থাপিত। কারণ, বিভিন্ন স্বরসম্পৃক্ত হইয়া একই ব্যঞ্জনবর্ণ বিভিন্ন সংখ্যা জ্ঞাপন করে। স্বরগুলি আবার অঙ্কস্থানেরই পরিচায়ক। সুতরাং বলিতে হইবে যে, বিভিন্ন অঙ্কস্থানে বসিয়া একই অঙ্ক (ব্যঞ্জন-বোধিত) বিভিন্ন সংখ্যা খ্যাপন করে।

আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী ও হিন্দু-দশমিক-প্রণালী

প্রসঙ্গক্রমে আর একটা বিষয় উত্থাপিত হইয়াছে। আমরা কিছুক্ষণ তাহার প্রতি প্রণিধান করিতে ইচ্ছা করি। আধুনিক হিন্দু-দশমিক-প্রণালী হইতে আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য কোথায়? সমস্ত সভ্যজগতে এখন যে সংখ্যা-প্রণালী অবলম্বিত হয়, তাহা হিন্দু কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। কোন্ হিন্দু ঋষি, কোন্ অতীত যুগে, কোন্ তীর্থস্থানে থাকিয়া এই প্রকারে সংখ্যা লিখিবার অতি সংক্ষিপ্ত ও সরল প্রণালী প্রথম পরিকল্পনা করেন,

---

১। G. R. Kaye, *Indian Mathematics*, p. 30; *The Bakhshali Manuscript*, p. 81.

২ কে'র এই দুইটি লেখা প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর প্রকৃত তত্ত্ব সাধারণে প্রচার হইয়াছিল। ফ্লীটের তদ্বিষয়ক প্রবন্ধ যে তিনি দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। তাঁহার *Indian Mathematics*এর ৬৯ পৃষ্ঠায় তিনি ফ্লীটের প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি যে কেন তিনি তাঁহার ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করেন নাই, তাহা বুঝিতে পারি না।

আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে স্থানীয়-মানের ব্যবহার নাই বলিয়া বার্ণেলও ভুল করিয়াছেন (*'South Indian Palæography'* p. 62 fn.)

আমরা তাহার কিছুই জ্ঞাত নহি। কিন্তু তাহা আর্য্যভটের জন্মের (৪৭৬ সাল) কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে[১]। আর্যভট যে তাহার বিষয় পরিজ্ঞাত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ আছে[২]। তথাপি তিনি এক উৎকট অক্ষর-সংখ্যা প্রণালীর পরিকল্পনা করিলেন কেন, তাহা জানিতে স্বতঃই ইচ্ছা হয়। উভয় প্রণালীই স্থানীয়-মানতত্ত্বের উপর সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত। দশমিক-প্রণালীতে অঙ্কবিশেষের স্থানীয়মান সংখ্যামধ্যে তাহার অবস্থিতি দেখিয়া বুঝিতে হয়, এবং তাহা অব্যাহত রাখিবার জন্য সময় সময় কোন 'স্বপ্রকাশ' অঙ্কের সঙ্গে 'পরপ্রকাশ' শূন্য চিহ্ন (০) জুড়িয়া দিতে হয়[৩]। শূন্য চিহ্ন একাকী অবস্থান করিয়া কোন সংখ্যা জ্ঞাপন না করিলেও অপর অঙ্কচিহ্নের পার্শ্বে বসিয়া তাহার স্থানীয়মান নির্ণয় করে এবং তাহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সেই অঙ্কটি কোন্ সংখ্যা জ্ঞাপনার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে স্বরবর্ণ-সম্পৃক্ত করিয়াই প্রত্যেক অঙ্কের স্থানীয়মান অপরোক্ষভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হয়। সুতরাং তাহার জন্য অপর কোন চিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। প্রত্যেক অঙ্কের সঙ্গে তাহার স্থানীয়মান দৃঢ় নিবদ্ধ আছে বলিয়াই সংখ্যা-বাক্যের যে কোন অংশে তাহা রাখা যায়। কিন্তু দশমিক-প্রণালীতে অঙ্কবিশেষে তাহার স্থানীয়মান অপরোক্ষরূপে অভিনিহিত থাকে না বলিয়াই, সংখ্যাবাক্যে তাহার অবস্থিতি পরিবর্ত্তন করা যায় না। ফলে আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর দ্বারা কোন বৃহৎ সংখ্যা দশমিক প্রণালী হইতেও সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করা যায়। যথা, আট লক্ষ লিখিতে দশমিক প্রণালী মতে ছয়টি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে ৮০০০০০। কিন্তু আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী মতে তাহা মাত্র একটা চিহ্নের দ্বারা লেখা যায়—'য়ু'।

আপাত প্রতীয়মান দোষ

বর্ত্তমান সময়ে আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর একটা বিশেষ দোষ দেখা যায়। সংস্কৃতভাষায় ও দেবনাগর অক্ষরে আর্য্যভটের গ্রন্থ লেখা। বর্ত্তমান সময়ে ঐ অক্ষরে ঌ-কারের রূপ এই প্রকার ঌ। ঋ-সম্পৃক্ত ল-কারের রূপও ঠিক ঐ প্রকারের। সুতরাং ঌ রূপ দেখিয়া বলিতে পারা যায় না যে, উহা ঌ-কার, না ঋ-কারান্ত ল-কার। এই

১। Bibhutibhusan Datta, "A Note on the Hindu-Arabic Numerals," *American Math. Monthly*, vol 33, 1926, pp 220—1; 'Early Literary Evidence of the Zero in India,' *Ibid*, pp, 419—53.

২। Sarada Kanta Ganguly, "The Elder Aryabhata and the modern arithmetical notation," *Amer Math Month.* 1927, pp 409—15

ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান করিবার বিষয় যে, আর্য্যভট সংখ্যাবিশেষের বর্গমূল ও ঘনমূল নিষ্কাশিত করিবার যে পন্থা বিবৃত করিয়াছেন, তাঁহার অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী মতে লিখিত সংখ্যায় তাহার প্রয়োগ করা যায় না।

৩। যে সকল অঙ্ক স্বতন্ত্রভাবে সংখ্যা জ্ঞাপন করিতে পারে, তাহাদিগকে আমরা 'স্বপ্রকাশ' অঙ্ক বলিব, যথা ১ হইতে ৯। যেটি নিজে স্বতন্ত্রভাবে কোন সংখ্যা বোঝায় না, কিন্তু অন্য অঙ্কের সঙ্গে মিলিত হইলে উভয়ে একত্রে সংখ্যা বুঝাইতে পারে, তাহাকে 'পরপ্রকাশ' বলিব।

হেতু সংখ্যাখ্যাপনে কি দোষ হইতে পারে, একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বুঝাইতেছি। মনে কর, ক্লৃজ একটা সংখ্যাখ্যাপক বাক্য। উহাকে 'কৢজ'ও মনে করা যাইতে পারে, অথবা 'ক্লৃজ'ও মনে করা যাইতে পারে। প্রথম প্রকার মনে করিলে ঐ বাক্যবোধিত সংখ্যা হইবে ১০০,০০০,০০৮। আর দ্বিতীয় প্রকার মনে করিলে হইবে ৩১,০০০,০০৮। আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতেই আমরা ইহার উদাহরণ দিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন যে এক যুগে চন্দ্রের ভগণসংখ্যা চয়গিয়িঙুছ্লৃ এবং পৃথিবীর ভগণসংখ্যা ঙিশিবুণ্লৃ ষ্খৃ। প্রথম বাক্যে লৃ চিহ্নকে ঋ-কারান্ত ল-কার বুঝিতে হইবে। দ্বিতীয়টাতে উহাকে ৯-কার মনে করিতে হইবে। বঙ্গীয় বর্ণমালায় ঐ দুই বাক্যকে যথাক্রমে 'চয়গিয়িঙুছ্লৃ' ও 'ঙিশিবৃণৢখ্ষৃ' লিখিতে হইবে। সুতরাং ঐ বাক্যদ্বয়-বোধিত সংখ্যা হইবে যথাক্রমে ৫৭৭৫৩৩৩৬ ও ১৫৮২২৩৭৫০০। ঐ বাক্যদ্বয়ের ভিন্নার্থ করিলে অন্য সংখ্যা পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাহা দৃগ্‌জ্যোতিষের সঙ্গে ঐক্য হয় না বলিয়া পরিত্যাজ্য। উপরিলিখিত প্রকার অর্থই গ্রন্থকারের অভীপ্সিত ছিল। কিন্তু যাঁহারা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় জানেন না বা দৃগ্‌জ্যোতিষের খবর রাখেন না, উপরি উদ্ধৃত বাক্যদ্বয় যে তাঁহাদিগকে ভ্রমে পাতিত করিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

দুর্গাদাস লাহিড়ীর "অভিনব" সিদ্ধান্ত

আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা বিষয়ে যে দোষের বিচার এখন করা হইল, তাহার উৎপত্তির একমাত্র কারণ, দেবনাগর অক্ষরে ৯-কার ও ঋ-কারান্ত ল-কারের রূপ অভিন্ন বলিয়া। বঙ্গীয় বর্ণমালায় উহাদের রূপ ভিন্ন। সুতরাং সংখ্যাবোধক বাক্যগুলি বঙ্গাক্ষরে লিখিত থাকিলে সেই দোষের উৎপত্তি হইতে পারে না। একমাত্র এই কারণ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয় তিনটি "অভিনব" সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে[১],—

১। "আর্য্যভটের সময় বঙ্গীয় বর্ণমালাই প্রচলিত ছিল।

২। "আর্য্যভট বাঙ্গালী ছিলেন, তিনি বঙ্গীয় বর্ণমালাই ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

৩। "বঙ্গদেশই বীজগণিতের উৎপত্তিস্থান, বাঙ্গালী আর্য্যভটই বীজগণিতের প্রবর্ত্তয়িতা।"

তাহার খণ্ডন

পণ্ডিত লাহিড়ী মহাশয়ের ঐ সিদ্ধান্ত যুক্তিসহ নহে। বরং বিচক্ষণতার অভাবেরই পরিচায়ক। সকল দিক্ বিশেষভাবে তলাইয়া না দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আর্য্যভটের জন্মস্থান সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থ হইতে এইমাত্র সঙ্কেত পাওয়া যায়[২],—

"ব্রহ্মকুশশিবুধভৃগুরবিকুজগুরুকোণভগণান্নমস্কৃত্য।
আর্যাভটস্ত্বিহ নিগদতি কুসুমপুরেঽভ্যর্চ্চিতং জ্ঞানম্॥"

১। শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী, 'পৃথিবীর ইতিহাস,' ৪র্থ খণ্ড, ১৭৮ পৃষ্ঠা। পণ্ডিত লাহিড়ী মহাশয় ঐ বিষয়ে 'ভারতী' পত্রিকায়ও এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সন, তারিখ দেওয়া না থাকাতে আমি উহার সন্ধান করিতে পারি নাই; তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়াও কোন ফল হয় নাই।

২। আর্য্যভটীয়, গণিতপাদ, ১ম শ্লোক।

অর্থাৎ "পৃথিবী, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, সূর্য্য, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রাধিষ্ঠিত ব্রহ্মকে প্রণিপাত করিয়া আর্য্যভট এই গ্রন্থে কুসুমপুরে অভ্যর্চ্চিত জ্ঞান বিবৃত করিতেছেন।" ইহাতে মনে হয় যে, আর্য্যভট কুসুমপুরের লোক ছিলেন। তাঁহার টীকাকার পরমেশ্বর স্পষ্টতঃ সেই কথাই বলিয়াছেন, -"কুসুমপুরে কুসুমপুরাখ্যেঽস্মিন্ দেশে।" সুতরাং আর্য্যভট বাঙ্গালী ছিলেন না। সেই পাটলীপুত্রে বাঙ্গালী উপনিবেশ ছিল কি না, থাকিলেও তাঁহারা বাংলা অক্ষরে লিখিতেন কি না, ইত্যাদি বিষয়ে কল্পনা জল্পনা করা বৃথা মনে করি। উপরি উদ্ধৃত শ্লোকের চতুর্থ চরণের ভিন্ন প্রকার অর্থ করিয়া, লাহিড়ী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমর্থনের চেষ্টা করা যাইতে পারে,--"আর্য্যভট কুসুমপুর (নগরী) হইতে অভ্যর্চ্চিত জ্ঞানের আহরণ করিয়া, অন্যত্র বসিয়া তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন।" এই প্রকার ব্যাখ্যাও সঙ্গত হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃতপক্ষে শ্লোকের ঐ স্থলটি দ্ব্যর্থ-বোধক। যাঁহার যেই প্রকার ইচ্ছা, তিনি সেই প্রকার অর্থ করিতে পারেন। তথাপিও লাহিড়ী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত টিকে না। কারণ, আর্য্যভটের জন্মস্থান ঐ প্রকারে অনিশ্চিত থাকিলেও তিনি যে, বঙ্গীয় বর্ণমালা ব্যবহার করেন নাই, তাহা সত্য। বাঙ্গালা অক্ষরে ৯-কার ও লৃ-কারের রূপ ভিন্ন হইলেও বর্গীয় বকার ও অন্তস্থ বকারের রূপ অভিন্ন। অথচ অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী মতে তাহাদের বোধিত সংখ্যা ভিন্ন। বাংলা অক্ষরে লিখিত কোন সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে ব-কার থাকিলে, তাহাকে বর্গীয় বকার, কি অন্তস্থ বকার বুঝিতে হইবে, তাহা লইয়া মুস্কিলে পড়িতে হইবে। সুতরাং ঐ বাক্যনির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বিষয়ে মতদ্বৈধতা হইতে পারে। আর্য্যভটের গ্রন্থেই এই দৃষ্টান্ত বিরল নহে, পূর্ব্বে যেই উদাহরণ দ্বারা আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যায় দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে, তাহারই একটি এই দোষদুষ্ট। যথা, ভিশিবুণ্লৃষ্খৃ। ইহাকে বাংলা অক্ষরে লিখিলে হইবে 'ভিশিবুণ্৯খৃষৃ'। সুতরাং তদ্বোধিত সংখ্যা ১৫৮২২৩৭৫০০০ও হইতে পারে, ১৫৮২৬০৭৫০০০ও হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শ্রদ্ধেয় লাহিড়ী মহাশয় এক দোষ ক্ষালন করিতে গিয়া অন্য দোষাগমনের পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছেন।

তাঁহার সিদ্ধান্তের অপর দোষও আছে। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে, আর্য্যভটের সময়ে বঙ্গীয় বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। আর্য্যভটের জন্মস্থান ও কর্ম্মস্থান অনিশ্চিত দোষ দুষ্ট হইলেও তাঁহার জন্মকাল সর্ব্বপ্রকার দোষবিনির্মুক্ত। তিনি বলিয়াছেন,[১]—

ষষ্ট্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মতোঽতীতাঃ॥

"(সাতাইশ মন্বন্তর ও) তিন যুগ অতীতের পর আরো ৩৬০০ বর্ষ গত হইলে বর্ত্তমান সময়ে আমার জন্ম হইতে ২৩ বৎসর গিয়াছে।" শককালারম্ভের ৩১৭৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান কলিযুগ আরম্ভ হইয়াছে। সুতরাং আর্য্যভট ৪২১ (=৩৬০০—৩১৭৯) শকে তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। তখন তাঁহার বয়স ২৩ পার হইয়া গিয়াছে লিখিয়াছেন।

---

১ আর্য্যভটীয়, কালক্রিয়াপাদ, ১০ম শ্লোক।

সুতরাং ৩৯৮ শকে (=৪৭৫ বা ৪৭৬ খৃষ্ট সালে) তাঁহার জন্ম। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, সেই কালে বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি হয় নাই[১]।

লাহিড়ী মহাশয়ের যুক্তির অপর দুর্ব্বলতা এই,—বাংলা বর্ণমালাতে ন-কার ও ঋকারান্ত ল-কারের ভিন্ন রূপ আছে বলিয়াই যদি আর্য্যভটকে বাঙ্গালী বলিয়া দাবী করা যায়, তবে ভারতবর্ষের অপরাপর যে সকল প্রদেশের বর্ণমালাতে ঐ দুটা অক্ষরের রূপ ভিন্ন, সেই সকল প্রদেশবাসীও সমভাবে তাঁহাকে তদ্দেশবাসী ছিলেন বলিয়া দাবী করিতে পারেন। খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে প্রচলিত বর্ণমালার মধ্যে কোন কোনটাতে ন-কারের পৃথক্ রূপ ছিল বলিয়া জানা যায়।

এই সকল কারণে আমরা মনে করি যে, লাহিড়ী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সর্ব্বথৈব ভ্রান্ত। এখানে এ কথারও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আর্য্যভট-প্রণীত জ্যোতিঃশাস্ত্রের দাক্ষিণাত্যে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সমাজে, বহুল প্রচার দেখিয়া, কেহ কেহ শঙ্কা করেন যে, হয় ত আর্য্যভট দাক্ষিণাত্যের কোন নগরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন[২]। তবে সাধারণতঃ তাঁহাকে পাটলীপুত্রবাসী বলিয়াই স্বীকার করা হইয়া থাকে।

আর্য্যভটের দোষক্ষালন

বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে, খৃষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকের সমকালে উত্তর-ভারতবর্ষে তিন প্রকারের বর্ণমালা প্রচলিত ছিল—প্রাচ্য বর্ণমালা, প্রতীচ্য বর্ণমালা ও মধ্যদেশীয় বর্ণমালা। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল প্রদেশকে, আসাম, বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার বলা হয়, ঐ সকল প্রদেশে সেই কালে প্রাচ্য বর্ণমালা প্রচলিত ছিল। যুক্তপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের পূর্ব্বাংশেও ঐ বর্ণমালা ব্যবহৃত হইত। বাংলা, আসামী, মৈথিলী ও উড়িয়া বর্ণমালার উৎপত্তি ঐ প্রাচ্য বর্ণমালা হইতে। খৃষ্টীয় ৭ম শতকে প্রাচ্য বর্ণমালার পরিবর্ত্তে ঐ সকল দেশে কায়েথী বর্ণমালা প্রচলিত হয়। তখনো দেবনাগরী বর্ণমালার জন্ম হয় নাই। সুতরাং বলিতে হইবে যে, আর্য্যভট আপনার অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে প্রাচ্য বর্ণমালার ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং ঐ বর্ণমালাতেই আপনার গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের প্রথমাংশে ঐ বর্ণমালাতে লিখিত 'উষ্ণীষবিজয়ধারিণী' নামে একখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি জাপানদেশের হোরুজীর দেবমন্দিরে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে ন-কারের পৃথক্ ও বিশিষ্ট রূপ আছে দৃষ্ট হয়। সুতরাং বলিতে হইবে যে, প্রথম পরিকল্পনার সময়ে আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে কোন দোষ ছিল না। কালের আবর্ত্তনে বর্ণমালার পরিবর্ত্তন হইয়া যাওয়াতে তাহাতে যে দোষ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জন্য আর্য্যভট দায়ী নহেন।

১। বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি বিষয়ে নিম্নলিখিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য—

Rakhaldas Banerjee, *The Origin of the Bengali Scripts*, Calcutta, 1919.

Suniti Kumar Chatterjee, *The Origin and Development of the Bengali Language*, Part I, Calcutta, 1926.

২। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ১১১ পৃষ্ঠা।

কটপযাদি প্রণালী

ভারতবর্ষে আরো এক প্রকার অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর আবিষ্কার হইয়াছিল। তাহাকে সাধারণতঃ "কটপযাদি" প্রণালী" বলা হইত। ঐ প্রণালীতে অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা-খ্যাপিকা শক্তি নিম্ন প্রকার,—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	০
ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্	চ্	ছ্	জ্	ঝ্	ঞ্
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	ণ্	ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্					
য্	র্	ল্	ব্	শ্	ষ্	স্	হ্	ळ्	

প্রত্যেক শ্রেণীর আগক্ষরের সমাহার হইতে "কটপযাদি" নামের উৎপত্তি।

স্বরবর্ণের ও সংযুক্ত বর্ণের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি, এবং সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিবার ক্রম প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য লইয়া কটপযাদি প্রণালীতে কয়েকটি অন্তর্ভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল দেখা যায়। আমরা তাহার পৃথক্ পৃথক্ আলোচনা করিতেছি।

প্রথম বিভেদ

কটপযাদি প্রণালীর প্রথম অন্তর্বিভেদের বৈশিষ্ট্য এই প্রকার যে, উহাতে—

১। স্বরবর্ণের অঙ্কখ্যাপিকা বা অঙ্কস্থাননির্দ্দেশিকা কোন প্রকারের শক্তি নাই। তাহারা ব্যঞ্জনসম্পৃক্ত হইয়া ব্যতীত অসম্পৃক্ত অবস্থায় সংখ্যাখ্যাপক বাক্যে অবস্থান করিতে পারে না। আবার যে কোন স্বরবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও ব্যঞ্জনবর্ণবিশেষের স্বনিহিত অঙ্কজ্ঞাপিকা শক্তির বিন্দুমাত্র বিপর্য্যয় বা ব্যতিক্রম হয় না। সুতরাং গ্, গ, গা, গি, গী, ইত্যাদি সকলে একই অঙ্ক ৩ জ্ঞাপন করে।

২। সংযুক্ত বর্ণের প্রত্যেকটিই স্বনির্দ্দিষ্ট অঙ্ক জ্ঞাপন করে।

৩। কোন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে হইলে দক্ষিণাগতি অনুসরণ করিতে হয়, অর্থাৎ সেই বাক্যস্থ অক্ষরগুলি যেই ক্রমে সজ্জিত আছে, তাহাদের বিজ্ঞাপিত অঙ্কগুলিও সেই ক্রমে সাজাইতে হয়।

উদাহরণস্বরূপে বলা যাইতে পারে, 'কমধগসনমযচসিয়া'—১৭৯৩৭০৫৪৬৭১, 'রূপুভিধু-লটীরদমনৈ'—১৩১৪৯৩১২৮৫০০; 'ঢজহেকুনহেৎসভা'—৪৮৮১০৮৬৭৪, 'প্রগিলিনিখিলিস্ম-কুনিনিধি'—১২৩৩০২৩৭৫১০০৯।

দ্বিতীয় আর্য্যভট

এই প্রণালীর প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়, দ্বিতীয় আর্য্যভট-প্রণীত 'মহার্য্যসিদ্ধান্তে'। এই গ্রন্থকে সংক্ষেপে 'মহাসিদ্ধান্ত'ও বলা হয়[১]। এই আর্য্যভটের জন্মস্থান অজ্ঞাত। খৃষ্টীয় ৯৫০ সালে তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন। আর্য্যভট বলেন[২]—

১। ১৯১০ সালে বেনারস হইতে পণ্ডিত সুধাকর দ্বিবেদী 'মহাসিদ্ধান্ত' মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন।

২। 'মহাসিদ্ধান্ত,' মধ্যমাধ্যায়, ২য় শ্লোক।

"রূপাৎ কটপযপূর্বা বর্ণা বর্ণক্রমাদ্ভবন্ত্যঙ্কাঃ।
ঞনৌ শূন্যং প্রথমার্থে আ ছেদে ঐ তৃতীয়ার্থে ॥"

"ক, ট, প, য হইতে আরম্ভ বর্ণ ক্রমে ১ হইতে (ঊর্দ্ধতন) অঙ্ক হয়। ঞ ও ন শূন্য। পদবিগ্রহে প্রথমা বিভক্তিতে আ ও তৃতীয়া বিভক্তিতে ঐ (হইবে)।"

বিভক্তির কথা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, সংস্কৃত ভাষায় প্রথমা ও তৃতীয়া বিভক্তির বহুবচনে বাক্যে 'আঃ' ও 'ঐঃ' প্রত্যয় হয়। তাহাতে সংখ্যাবোধক বাক্যে অনর্থ ঘটিতে পারে। তাই বিসর্গলোপের বিধি করা হইয়াছে। যথা—"ত্তরামা' 'চরণ' দ্বারা গুণিত হইয়া..."ইত্যাদি প্রকার বাক্য থাকিলে তাহাকে সংস্কৃতে বলিতে হইবে, "ত্তরামা চরণৈ গুণিতা।" বিশুদ্ধ সংস্কৃতে লিখিলে সন্ধিবশতঃ ঐ বাক্যটি এই প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইবে,—"ত্তরামাশ্চরণৈর্গুণিতা"। তাহাতে 'শ' ও 'র' এর আগম হইয়া অনর্থ ঘটাইয়া দিবে।

দ্বিতীয় বিভেদ

কটপযাদি প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের বৈশিষ্ট্য এই প্রকার যে, উহাতে—

১। স্বরবর্ণ অসম্পৃক্ত অবস্থায় শূন্য জ্ঞাপন করে। কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলে তাহাদের কোন প্রকার শক্তিই থাকে না।

২। সংযুক্ত বর্ণের শেষ বর্ণই সংখ্যাখ্যাপন করিতে পারে, অপরগুলি নিরর্থক।

৩। অসম্পৃক্ত ব্যঞ্জনের অঙ্কখ্যাপনশক্তি থাকে না। আবার যে কোন স্বরবর্ণের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও ব্যঞ্জনবিশেষের অঙ্কখ্যাপনশক্তি অবিকৃত থাকে। অনুস্বার ও বিসর্গের যে অঙ্কখ্যাপিকা কোন শক্তি নাই, তাহা বলা বাহুল্য।

৪। কোন সংখ্যাজ্ঞাপক বাক্যকে অঙ্কে পাত করিতে হইলে বামাগতি অবলম্বন করিতে হয়। অর্থাৎ সেই বাক্যস্থ অক্ষরগুলি যেই ক্রমে সজ্জিত আছে, তদ্বিজ্ঞাপিত অঙ্কগুলিকে তাহার বিপরীত ক্রমে সাজাইতে হয়।

আমরা এই প্রণালীর একটা প্রাচীন উদাহরণ দিতেছি। ষড়্গুরুশিষ্য লিখিয়াছেন যে, কলিযুগের 'খগোস্ত্যান্মেষাপ' দিন গত হইবার পর তিনি তাঁহার 'বেদার্থদীপিকা' নামক গ্রন্থরচনা শেষ করেন[১]। এই বাক্যে ন্, ও ত্ নিরর্থক। খ=২, গ=৩, য= , ম=৫, ষ=৬, ম=৫, প=১।. সুতরাং কলির ১,৫৬৫,১৩২ দিন গতে গ্রন্থরচনা শেষ হয়। খৃষ্টীয় সালের হিসাবে ঐ দিন ১১৮৪ সালের ৪ঠা মার্চ্চ। মক্ষিভট্ট লিখিয়াছেন যে, তাঁহার টীকা রচনার সময়ে কলির 'হংসোভব' অব্দ গত হইয়াছিল। 'হংসোভব'=৪৪৭৮। সুতরাং ৪৪৭৮ কল্যব্দে বা ১৩৭৭ খৃষ্টীয় সালে মক্ষিভট্ট জীবিত ছিলেন।

এই প্রণালীর ব্যাখ্যাকালে ফ্লীট[২] বলেন যে, বাক্যের আদিতে অবস্থিত স্বরবর্ণই শূন্য জ্ঞাপন করে। তাঁহার ঐ মন্তব্য ভিত্তিহীন।

সূর্য্যদেব যজ্বা কখন কখন সংখ্যাবোধক বাক্যে অনাবশ্যক অক্ষরও যোগ করিয়া

১। *Indian Antiquary*, xxi, p. 49

২। J. F. Fleet, "The Katapayadi System of Expressing Numbers," *J.R.A.S.* 1911, pp. 788—794.

দিয়াছেন। যথা, ৪৪৯ সংখ্যার জন্ত তিনি লিখিয়াছেন—'ধীভবন' (=০৪৪৯)। এ স্থলে শেষের নকার অনাবশ্যক। সেই প্রকার, 'নূনমীজন'—৮৯০।[১]

এই মতের মূল ও তাহার পাঠ-ভেদ

কটপযাদি প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের মূল যে কোথায়, তাহা জানা যায় নাই। 'সদ্‌রত্নমালা' নামক গ্রন্থে দেখা যায়[২],—

"নঞাবচশ্চ শূন্যানি সঙ্খ্যা কটপযাদয়ঃ।
মিশ্রে তূপান্ত্যহল্ সঙ্খ্যা ন চ চিন্ত্যো হলস্বরঃ॥"

"ন, ঞ ও স্বরবর্ণ শূন্য; ক, ট, প, য আদি করিয়া সংখ্যা। সংযুক্ত বর্ণের শেষ বর্ণই সঙ্খ্যা; অস্বর ব্যঞ্জন চিন্তনীয় নহে।"

১৮২৭ সালে হুইষ[৩] এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। তাঁহার প্রবন্ধ হইতেই ফ্লীট উহা উদ্ধৃত করেন। তাঁহাদের উদ্ধৃত শ্লোকে সামান্য পাঠভেদ দৃষ্ট হয়। সেই শ্লোকের তৃতীয় চরণ এই প্রকার,—"মিশ্রে ত্বেবাস্ত্যহল্ সংখ্যা।" কিন্তু তাহাতে উদ্দেশ্য বিকৃত হয় না। ঐ শ্লোকের আরো দু এক প্রকার পাঠভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৫৮৭ সালে নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ স্বপ্রণীত 'জৈমিনীয় সূত্রে'র টীকায় 'প্রাচ্যকারিকা' নামক গ্রন্থ হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন,[৪]—

"কটপযবর্গভবৈরিহ পিণ্ডান্ত্যৈরক্ষরৈরঙ্কাঃ।
নঞি চ শূন্যং জ্ঞেয়ং তথা স্বরে কেবলে কথিতম্॥"

তৃতীয় বিভেদ—পালী প্রণালী

এই বিভেদ বিশেষভাবে পালী গ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয়। পালি ভাষায় সকার একটি, সংস্কৃতের মত তিনটি (শ, ষ, স) নহে। সেই হেতু কটপযাদি প্রণালীর যঁবর্গ অক্ষরের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তির কিছু পরিবর্তন করিতে হয়। যথা,—

য্=১, র্=২, ল্=৩, ব=৪, স্=৫, হ্=৬, ळ=৭

অন্যান্য বিষয়ে এই বিভেদ দ্বিতীয় বিভেদেরই অনুরূপ।

আধুনিক কালে ডাক্তার এল্. ডি. বার্নেট পালি প্রণালীর খবর প্রচার করেন[৫]। বর্ম্মা দেশ হইতে সংগৃহীত পালি ভাষায় লিখিত গ্রন্থবিশেষের পাণ্ডুলিপি হইতে তিনি কয়েকটি সংখ্যাজ্ঞাপক পদ সংগ্রহ করেন,—

১। 'আর্য্যভটীয়', গণিতপাদ, ১০ম শ্লোক (টীকা)।

২। মান্দ্রাজ সরকারের সংস্কৃত পুস্তকালয় হইতে আমি 'সদ্‌রত্নমালা'র এক পাণ্ডুলিপি আনাইয়াছি। তাহাতে এই শ্লোক আছে।

৩। C. M. Whish, loc cit হুইষের প্রবন্ধের ফরাসী অনুবাদ করিতে গিয়া জেকে লিখিয়াছেন।—

"নঞৌ বাচশ্চ শূন্যানি সংখ্যাঃ কটপযাদয়ঃ।
মিশ্রে তু বন্ত্যা হল্ সংখ্যা ন চ চিন্ত্যো হলস্বরঃ॥"

এই পাঠে ভুল আছে।

৪। 'জৈমিনীয়সূত্রম্,' পণ্ডিত শ্রীরাধাবল্লভ স্মৃতিব্যাকরণজ্যোতিস্তীর্থ-সম্পাদিত, ১ম অধ্যায়, ১ম পাদ, ৫ম শ্লোক [টীকা]।

৫। *JRAS*, 1907, p. 121 f.

অত্যুঞ্জয়ং = ১১৭০	গম্ভিথক্কে = ১২৫৩
শুণগ্ গ্রং = ২৩৫৩	ভাসুবক্থং = ২৪০৪
রট্ঠক্থয়ম্ = ১২২২	

চতুর্থ বিভেদ—কেরল প্রণালী

ইহাতে দক্ষিণাগতি অনুসৃত হয়। অপরাপর সকল বিষয়েই ইহা দ্বিতীয় বিভেদেরই অনুরূপ। এই প্রকারের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালী বিশেষভাবে কেরলদেশে প্রচলিত আছে বলিয়া ইহাকে কেরল প্রণালী বলে।

কটপযাদি প্রণালীর উৎপত্তিকাল—সূর্য্যদেবের মত

কটপযাদি প্রণালীর উৎপত্তিকাল এখনো নির্দ্ধারিত হয় নাই। তাহার প্রথম বিভেদ খৃষ্টীয় দশম শতকের মধ্যভাগে দ্বিতীয় আর্য্যভটের মহাসিদ্ধান্তে দৃষ্ট হয়, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় বিভেদের ব্যবহার 'জৈমিনিসূত্রে' আছে। কিন্তু ঐ গ্রন্থ যে কখনকার লেখা, তাহা জানা নাই। সূত্রাকারে লেখা বলিয়া ও সুপ্রাচীন জৈমিনি ঋষির নামে পরিচিত বলিয়া, তাহাকে প্রাচীন আর্ষ গ্রন্থ বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু সে বিষয়ে কেহ কেহ সন্দেহ করেন।[১] টীকাকার নীলকণ্ঠ দৈবজ্ঞ যে 'প্রাচ্যকারিকা' গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারও রচনাকাল অজ্ঞাত। তিনি দুই এক স্থলে "বৃদ্ধৈরুক্তা" বলিয়া কোন অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২] তাহাতেও কটপযাদি প্রণালী (২য় বিভেদ) মতে অক্ষরসংখ্যা ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি আরো বলেন যে, 'শিবতাণ্ডব' প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ প্রণালীর ব্যবহার ছিল।[৩] উঁহাদের সময়ও জানা নাই।

সূর্য্যদেব যজ্বার লেখা দেখিয়া মনে হয় যে, তিনি কটপযাদি প্রণালী প্রথম আর্য্যভটের সময়ে (৪৯৯) ও প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার ঐ ধারণার মূল কোথায়, জানি না। আমরা তাহার উল্লেখ মাত্র করিতেছি। সূর্য্যদেব লিখিয়াছেন,—

"বর্গাক্ষরাণাং সংখ্যাপ্রতিপাদনে কটপাদিত্বং নঞোশ্চ শূন্যত্বমপি প্রসিদ্ধং, তন্নিরাসার্থং কাৎ গ্রহণং। কাৎ প্রভৃত্যেব বর্গাক্ষরাণাং সংখ্যা ন টকারাৎ পকারাচ্চ প্রভৃতি। কাৎ প্রভৃত্যেব সর্ব্বাণি সংখ্যা প্রতিপাদয়ন্তি ন তু ঞকারনকারয়োশ্চ শূন্যত্বমিত্যর্থঃ। অবর্গাক্ষরাণাং তু লোকেঽপি যকারবৈস্তবাদিত্বাৎ তদাদিত্বনিয়মস্যাপ্রয়োজনাদ্যকারাদিত্বং নোক্তং। কিন্তু তেষামপি লোকপ্রসিদ্ধৈনৈকাদিসংখ্যা প্রাপ্তা তদপবাদার্থমাহ 'ঙ্মৌ যঃ'।"

অপরাপর ভারতীয় প্রণালী

ভারতবর্ষে আরো কয়েক প্রকারে বর্ণমালার দ্বারা সংখ্যা জ্ঞাপিত হইত। আমরা এখন সেগুলিরই বিবরণ দিতেছি। তাহাদের কোনটাই বৃহৎ সংখ্যা লিখনের উপযোগী নহে।

১। শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত, 'ভারতীয় জ্যোতিঃশাস্ত্র', ৪৮০ পৃষ্ঠা। বরাহমিহির ও ভট্টোৎপল 'জৈমিনীয়সূত্রে'র উল্লেখ করেন নাই।

২। 'জৈমিনীয় সূত্র' ১।১।৮ ; ১।৩।১৪

৩। ঐ, ১।১।৩২

(ক) চৌত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণ ও ষোলটি স্বরবর্ণ সহযোগে এই প্রণালী গঠিত। ক হইতে হ পর্য্যন্ত মোট ৩৩শটি ব্যঞ্জনবর্ণ। তার সঙ্গে ড় অথবা ক্ষ যোগ করিলে চৌত্রিশ হইবে। স্বরবর্ণ—অ, আ, ই, ঈ, ঋ, ৠ, ঌ, ৡ, এ, ঐ, ও ঔ, অং অঃ। এই প্রণালীতে কি স্বরবর্ণ, কি ব্যঞ্জনবর্ণ, অসম্পৃক্ত অবস্থায় কোন বর্ণই সংখ্যা খ্যাপন করিতে পারে না। কিন্তু উভয়ে সম্পৃক্ত হইলে তাহাদের সংখ্যাখ্যাপিকা শক্তির আগম হয়। অকার-সম্পৃক্ত হইয়া চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ যথাক্রমে ১ হইতে ৩৪ সংখ্যা খ্যাপন করে। আকার-সম্পৃক্ত হইলে তাহারা ৩৫ হইতে ৬৮ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। এই প্রকারে ইকার, ঈকার প্রভৃতি সম্পৃক্ত হইয়া ব্যঞ্জনবর্ণ উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতন সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। এই প্রণালীকে সাঙ্কেতিক উপায়ে অতি সহজে লেখা যায়। যদি N চিহ্ন কোন সংখ্যা জ্ঞাপন করে, তবে—

$$N = ৩৪ (x - ১) + y$$

যথায় x ও y চিহ্ন নিম্নলিখিত কোন সংখ্যা হইতে পারে,

$$x = ১, ২, ৩, \quad ১৬$$

$$y = ১, ২, ৩, \ldots ৩৪$$

প্রকৃতপক্ষে x এবং y স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ক্রমিক সংখ্যা। উদাহরণ স্বরূপে আমরা বিচার করিব যে, 'দী' কোন সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। ঈকার চতুর্থ স্বর ও দকার অষ্টাদশ ব্যঞ্জন। সুতরাং

$$\text{'দী'} = ৩৪ (৪ - ১) + ১৮ = ১২০$$

(খ) ইহাতেও উপরে কথিত চৌত্রিশ ব্যঞ্জনবর্ণ ও ষোড়শ স্বরবর্ণ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সম্পৃক্ত হইলে তাহাতে ভিন্ন প্রকারের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তির আবির্ভাব হয়। উপরের প্রণালীতে ব্যঞ্জনবর্ণের প্রভাব মুখ্য, স্বরবর্ণের প্রভাব গৌণ। কিন্তু এই প্রণালীতে তাহাদের প্রভাব সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বরবর্ণেরই মুখ্য স্থান। ককার সম্পৃক্ত হইয়া ষোলটি স্বরবর্ণ যথাক্রমে ১ হইতে ১৬ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে, খকার সম্পৃক্ত হইয়া তাহারা ১৭ হইতে ৩২ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। গকার, ঘকার প্রভৃতি সম্পৃক্ত হইয়া ঐ ষোলটি স্বর এই প্রকারে ক্রমে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতন সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। পূর্ব্বেকার মত সাঙ্কেতিক উপায়ে লিখিলে,

$$N = ১৬ (y - ১) + x$$

যথায় আগের মতনই x এবং y স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণেরই ক্রমিক সংখ্যা বুঝিতে হইবে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সংখ্যা-চিহ্ন 'দী' এই প্রণালী মতে ২৭৬ সংখ্যা বুঝাইবে। কারণ—

$$\text{'দী'} = ১৬ (১৮ - ১) + ৪ = ২৭৬$$

(গ) কখন কখন দেখা যায় যে, ঋ, ৠ, ঌ এবং ৡ সংখ্যার্থে পরিগৃহীত হয় নাই। সুতরাং স্বরবর্ণ-সংখ্যা তখন ১২ হইবে। ককার সম্পৃক্ত হইয়া ঐ বারটি স্বর যথাক্রমে ১ হইতে ১২ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে; খকার সম্পৃক্ত হইয়া ১৩ হইতে ২৪ সংখ্যা খ্যাপন করে; ইত্যাদি। সাঙ্কেতিক মতে—

$$N = ১২ (y - ১) + x$$

যথায় $x = ১, ২, ৩, \ldots ১২$

$y = ১, ২, ৩, \ldots ৩৪.$

উপরে যে তিন প্রকারের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর বর্ণনা করা হইল, তাহারা বিশেষভাবে হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করিতেই ব্যবহৃত হইত। (ক) প্রণালীর ব্যবহার মালাবার ও তেলেগু প্রদেশের এবং সিংহল, ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিতে দেখা যায়। (খ) প্রণালী সিংহলের পালী ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপিতে দৃষ্ট হয়। (গ) প্রণালীর পরিচয় পাওয়া যায়—ভিয়েনা সহরের রাজকীয় পুস্তকাগারে রক্ষিত পালী গ্রন্থবিশেষের পাণ্ডুলিপিতে।[১]

এতদ্ব্যতীত আরো দুইটি সাধারণ রকমের অক্ষরসংখ্যার পরিচয় ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। বৈয়াকরণ-শ্রেষ্ঠ পাণিনি (প্রায় ৭০০ খৃষ্ট পূর্ব্ব শতক) ও বর্ণমালা সহায়ে সংখ্যা প্রকাশ করিতেন। তিনি শিবসূত্রানুযায়ী নয়টি স্বরবর্ণ ও তেত্রিশটি ব্যঞ্জনবর্ণের সহযোগে ক্রমানুসারে ১ হইতে ৪২ সংখ্যা জ্ঞাপন করিতেন দেখা যায়। সুতরাং তাঁহার মতে অ = ১, ই = ২, উ = ৩, ইত্যাদি। বিয়াল্লিশের ঊর্দ্ধতন সংখ্যা তিনি নির্দ্দেশ করিতে জানিতেন না।[২]

এ দেশে বর্ণমালা সহায়ে জপের সংখ্যা রাখার একটা প্রণালীও ছিল। ইহাতে ১৬টি স্বরবর্ণ ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণের প্রয়োগ হইত। মন্ত্রের প্রতিবার জপের শেষে পর পর এক একটি বর্ণ উচ্চারণ করিয়া গেলে, ৫০ পর্য্যন্ত জপের সংখ্যা গণনা করা যায়। তৎপর চন্দ্রবিন্দু সম্পৃক্ত করিয়া ঐ বর্ণের দ্বারা ৫১ হইতে ১০০ সংখ্যার হিসাব রাখা যায়। আবার অনুস্বার যোগে অষ্ট অন্তিম বর্ণ (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম, ব, স, ক্ষ) ১০১ হইতে ১০৮ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। এইরূপে বর্ণ সহায়ে ১০৮ বার জপের সংখ্যা রাখা যায়। তদূর্দ্ধ সংখ্যার জন্য ইহার প্রয়োগ হয় না। 'সনৎকুমারসংহিতা' ও তন্ত্রাদিতে এই প্রকারে জপের সংখ্যা রাখার বিধির বিশেষ প্রচলন দেখা যায়।

ভারতবর্ষে জ্যোতিষগণনাদিতে আর একপ্রকার অক্ষরসংখ্যার প্রচলন ছিল দেখা যায়। 'স্বরোদয়' শাস্ত্রে 'জীবস্বর' গণনার নিয়ম আছে,[৩]—

"ষোড়শাক্ষরকোঽবর্গঃ স্যাৎ কাদিবর্গস্তু পঞ্চকাঃ।
চতুর্ব্বর্ণৌ যশৌ বর্গৌ সংখ্যা বর্গেষু কীর্ত্তিতাঃ॥
নাম্নো বর্ণাঃ স্বরগ্রাহ্যা বর্গাণাং বর্ণসংখ্যয়া।
পিণ্ডিতা পঞ্চভির্ভক্তা শেষং জীবস্বরং বিদুঃ॥"

এ স্থলে অ, আ,.. ...অং, অঃ যথাক্রমে ১, ২,...১৫,১৬ সংখ্যা নির্দ্দেশ করে। এবং—

১। Bühler, *Indian Palæography*; Burnell, *South Indian Palæogrophy*, বিশেষ ভাবে দ্রষ্টব্য।

২। Goldstücker, *Panini*, p. 53. পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণের এক একটি সূত্রের অধিকার নির্দ্দেশ করিতে অক্ষর-সংখ্যার ব্যবহার করিতেন। 'বার্ত্তিক'কার কাত্যায়ন (৪০০ খ্রীঃ পূঃ) ও 'মহাভাষ্য'কার পতঞ্জলি (১৫০ খৃঃ পূঃ) বলেন যে, যখন কোন সূত্রবিশেষের অধিকারগত সূত্রের সংখ্যা মোট বর্ণসংখ্যার অধিক হইত, তখন পাণিনি 'প্রাক্' শব্দ ব্যবহার করিয়া অধিকার নির্দ্দেশ করিতেন। অর্থাৎ তখন তাঁহাকে সঙ্কেত ব্যবহার ছাড়িয়া খোলা ভাবেই বলিতে হইত যে, অমুক সূত্রের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সূত্রবিশেষের অধিকার চলিবে। ইহাতেই বোঝা যায় যে, পাণিনি ৪২ এর চেয়ে বড় সংখ্যা অক্ষর দ্বারা সূচিত করিতে পারিতেন না। (Goldstücker, loc. cit., pp. 50 ff.)

৩। 'বিশ্বকোষে' বৃত্ত স্বজন; 'বর্ণযোজনা' দেখ।

১	২	৩	৪	৫
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	
শ	ষ	স	হ	

মনে কর, 'রসিকমোহন' এই নামের জীবস্বব বাহির করিতে হইবে। 'রসিকমোহন' =র+স+ই+ক+ম+ও+হ+ন=২×৩+৩+১+৫+১৩+৪+৫=৩৬। উহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে ১ অবশিষ্ট থাকিবে। সুতরাং জীবস্বর ১।

গ্রীক প্রণালী

গ্রীস দেশেও এককালে বর্ণমালা দ্বারা সংখ্যা-লিখন-পদ্ধতির বিশেষ প্রচলন ছিল। তখন সেই দেশের সর্ব্বপ্রকার গণনা অক্ষরসংখ্যার দ্বারা করা হইত। গ্রীক প্রণালী হিন্দু প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। গ্রীক ভাষার বর্ণ-সংখ্যা মোট চব্বিশটি। সংখ্যা-প্রণালী গঠনোদ্দেশে গ্রীকেরা আরো তিনটি বর্ণ সংগ্রহ করে। তাহার দুইটি (ϙ ও ϡ) ফিনীশীয় জাতি হইতে ধার করা হয়।[১] অপর একটা (ς) নিজের দেশেরই অপ্রচলিত প্রাচীন অক্ষর। ঐ ২৭টি অক্ষরকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া, গ্রীকগণ তদ্দ্বারা নিম্নোক্ত প্রকারে সংখ্যা নির্দ্দেশ করিত,—

α=১	ι=১০	ρ=১০০
β=২	κ=২০	σ=২০০
γ=৩	λ=৩০	τ=৩০০
δ=৪	μ=৪০	υ=৪০০
ε=৫	ν=৫০	φ=৫০০
ς=৬	ξ=৬০	χ=৬০০
ζ=৭	ο=৭০	ψ=৭০০
η=৮	π=৮০	ω=৮০০
θ=৯	ϙ=৯০	ϡ=৯০০

ঐ সকল অক্ষরের সমাহার দ্বারা ১ হইতে ৯৯৯ পর্য্যন্ত যে কোন সংখ্যা জ্ঞাপন করা যায়। হাজার বা ততোধিক সংখ্যা প্রকাশ করিতে গ্রীকগণ ঐ সকল অক্ষরের পশ্চাদ্ভাগে একটা দাগ কাটিয়া দিত। কোন অক্ষরের পশ্চাদ্ভাগ ঐরূপে চিহ্নিত করিয়া দিলে তাহার সংখ্যাজ্ঞাপক শক্তি হাজার গুণ বৃদ্ধি পায়। যথা—

/α=১০০০, /β=২০০১, /γ=৩০০০, ...

দশ হাজার বা ততোধিক সংখ্যা প্রকাশ করিতে গ্রীকগণ আর একটি উপায় অবলম্বন করে। যে কোন অক্ষর-সংখ্যার সঙ্গে M যুক্ত করিয়া দিলে তাহার শক্তি দশ হাজার গুণ

১। গ্রীকবর্ণমালা সর্ব্বাংশে ফিনীশীয় জাতি হইতে প্রাপ্ত, কিন্তু গ্রীকগণ কালে তাহাকে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করে। এই প্রকারে কালক্রমে দুই জাতির বর্ণমালার রূপ ও সংখ্যা ভিন্ন হইয়া যায়।

বৃদ্ধি পাইত। ঐ অক্ষর M এর সম্মুখে, পশ্চাতে বা শীর্ষে যে কোন স্থলে থাকিতে পারিত। যথা,—

$$M = 10{,}000;\ \gamma M,\ M\gamma,\ \text{বা}\ \overset{\gamma}{M} = \text{৩০,০০০, ইত্যাদি।}$$

সাধারণ বাক্য হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিবার জন্য গ্রীকগণ সময় সময় সংখ্যা-জ্ঞাপক বাক্যের মাথার উপরে একটা দাগ কাটিয়া দিত। যথা—

$$\overline{\delta\, M/\gamma\chi o\eta} = \text{৪৩,৬৭৮}$$

$$M^{/\zeta o\rho\epsilon}/\epsilon\omega o\epsilon = \text{৬১,৭৫৫,৮৭৫}$$

গ্রীক অক্ষরসংখ্যার প্রথমাবস্থা

প্রাচীন গ্রীকগণ সংখ্যাজ্ঞাপনার্থ বর্ণমালার ব্যবহার যখন প্রথম আরম্ভ করে, তখন তাহারা উপবি উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিত না। ওটা পরবর্ত্তী কালে কল্পিত। আদিতে তাহারা পাণিনির পদ্ধতিই অনুসরণ করিত। গ্রীকবর্ণমালার চব্বিশটি অক্ষর তখন ১ হইতে ২৪ সংখ্যা খ্যাপন করিত। দুই বা ততোধিক সংখ্যার সমাহার দ্বারা ও আবশ্যক মত অক্ষরবিশেষের একাধিক বার প্রয়োগ দ্বারা চব্বিশের উর্দ্ধতন সংখ্যা বিজ্ঞাপিত হইত। কখন কখন গ্রীকগণ উর্দ্ধতন সংখ্যা বিজ্ঞাপনের জন্য আর একটা নিয়ম অনুসরণ করিত। বর্ণমালার আদ্যক্ষর αকে ২৪এর প্রতীকরূপে ব্যবহার করিত। সুতরাং এই মতে $\alpha\theta$ = ২৪ + ৯ = ৩৩। এই নিয়ম যে বিশেষ দোষদুষ্ট, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইবে। কারণ, $\alpha\theta$ যে ১ + ৯ = ১০ নহে, তাহা কে বলিবে? ভারতবর্ষের তৃতীয় (ক) ও (খ) প্রণালীও কতকাংশে এইরূপ হইলেও তাহারা গ্রীক আদিম প্রণালী হইতে শ্রেষ্ঠ। কারণ, স্বরবর্ণ সহায়ে হিন্দুগণ অতি সহজে এই দোষ কাটাইতে পারিত। যেমন ভারতবর্ষে, তেমন গ্রীসেও সুপ্রণালীবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার আবিষ্কারের পরেও সাধারণ কাজে আদিম পদ্ধতির প্রচলন ছিল।

সেমিটিক প্রণালী

প্রাচীন গ্রীকদের ন্যায় হিব্রু, আরব প্রভৃতি সেমিটিক জাতিগণও বর্ণমালা দ্বারা সংখ্যা খ্যাপন করিত। তাহাদের অবলম্বিত প্রণালী সর্ব্বাংশে গ্রীক প্রণালীরই অনুরূপ। যথা, বর্ণমালার প্রথম নয় অক্ষর ১ হইতে যথাক্রমে ৯ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিত, পরবর্ত্তী নয় অক্ষর যথাক্রমে তাহাদের দশগুণ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিত এবং তৎপরবর্ত্তী অক্ষর উহাদের শতগুণ সংখ্যা খ্যাপন করিত। প্রত্যেক জাতির বর্ণমালার রূপ পৃথক্ ছিল মাত্র। তাই আমরা তাহার পৃথক্ উল্লেখ করিলাম না।[১] আরবী বর্ণমালায় অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য হিব্রু অক্ষর হইতে পৃথক্ হইলেও সংখ্যানির্দ্দেশের সময়ে আরবেরা হিব্রু পৌর্ব্বাপর্য্যই অনুসরণ করিত। তাহাতে বোঝা যায়, আরবেরা অক্ষরসংখ্যার প্রথা হিব্রুদের নিকট হইতে গ্রহণ করে। আল্‌বিরুণীও সেই কথা বলিয়াছেন।[২]

১। আরবী অক্ষরসংখ্যার পরিচয় ও হিব্রু অক্ষরসংখ্যার সহিত তাহার তুলনা জন টেলর কৃত লীলাবতীর অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় দেওয়া আছে।

২। *Alberuni's India*, vol. I, p. 174.

অক্ষরসংখ্যা ও স্থানীয়মান

আমরা পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছি যে, আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে স্থানীয়মানতত্ত্ব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট না হইলেও পরোক্ষভাবে আছে। কটপযাদি প্রণালীতে ঐ তত্ত্ব হিন্দু-দশমিক-প্রণালীর মতনই প্রত্যক্ষ। অপরাপর হিন্দু প্রণালীতে ঐ তত্ত্বের সম্পূর্ণ অভাব দৃষ্ট হয়। তাহাদের ব্যবহার এত সঙ্কীর্ণ যে, তাহাদিগকে উল্লেখযোগ্য প্রণালী বলাও যায় না। গ্রীক ও সেমিটিক প্রণালীতে স্থানীয়মানতত্ত্বের কোন প্রকার চিহ্ন নাই। এইটা বিশেষ করিয়া প্রণিধানযোগ্য।

অক্ষরসংখ্যার উৎপত্তি

কোন্ জাতি কোন্ কালে যে অক্ষরসংখ্যার প্রথম প্রচলন করে, তাহা আজ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। গণিতৈতিহাসিকগণের কেহ কেহ মনে করেন যে, সর্ব্বপ্রথমে কোন না কোন সেমিটিক জাতি সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ বর্ণমালার প্রয়োগ করিয়া থাকিবে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, ফিনীশীয় জাতি সর্ব্বপ্রথমে বর্ণমালার আবিষ্কার করে। তাহাদের এবং ব্যাবিলন, কাল্ডী ও আসুর প্রভৃতি সেমিটিক জাতি হইতে পরিস্থিত প্রাচীন জাতিগণ শিক্ষা, দীক্ষা ও সভ্যতার অনেক কিছুই গ্রহণ করে। গ্রীক বর্ণমালাও ফিনীশীয় জাতি হইতে পাওয়া। এই সকল কারণ হইতে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, অক্ষরসংখ্যাও কোন সেমিটিক জাতি কর্ত্তৃক পরিকল্পিত হইয়া থাকিবে, এবং তাহাদের নিকট হইতে গ্রীক প্রভৃতি অন্যান্য জাতিরা পাইয়া থাকিবে। এই মতের সমর্থনে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, গ্রীক অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীতে তিনটা ফিনীশীয় অক্ষর রহিয়াছে। ক্যাণ্টর, নেসেলমান প্রভৃতি অনেক প্রসিদ্ধ গণিতৈতিহাসিকগণ এই অনুমানে বিশ্বাস করেন।[১] অপরে ইহাতে আপত্তি করেন। তাঁহারা বলেন যে, ফিনীশীয় বা অপর কোন সুপ্রাচীন সেমিটিক জাতি অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার করিয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই। ইহুদীগণও সেমিটিক বটে। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকে তাহারা অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার করিত জানা যায়। সুতরাং ঐ সময়ের কিছু পূর্ব্বে তাহার প্রচলন হইয়া থাকিবে। কিন্তু কত পূর্ব্বে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। অপর পক্ষে গ্রীকেরা তাহার বহু পূর্ব্বে অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার করিত বলিয়া বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। এই কারণে গাউ ও হীদ প্রমুখ গ্রীক গণিতের ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, গ্রীকগণই সর্ব্বপ্রথমে সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ বর্ণমালার প্রয়োগ করিয়া থাকিবে।[২]

খৃষ্টীয় সালের চারি শত বৎসর পূর্ব্বের হলিকর্ণসাস নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালেখে সুপ্রণালীবদ্ধ অক্ষরসংখ্যার ব্যবহার হইয়াছিল দেখা যায়।[৩] উহাই গ্রীস দেশে

১। Cantor, *Geschichte der Mathematik*, Bd. I, Leipzig, 1907, pp. 121 ff.
Nesselmann, *Die Alegebra der Griechen*, pp. 74 ff.
Robbins and Karpinski, *Nicomachus of Geresa*, New York, 1926, p. 69.

২। Gow, *Short History of Greek Mathematics*, Cambridge, 1884, pp. 43 ff.
Heath, *History of Greek Mathematics*, vol. I, Oxford, 1921, pp. 32 f.

৩। গাউ বলেন যে, হলিকর্ণসাসে প্রাপ্ত শিলালেখের কাল ১৮০ খ্রীষ্টপূর্ব্ব সালের কাছাকাছি। (গাউ, 'গ্রীকগণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' ৪৭ পৃষ্ঠা।)

অক্ষরসংখ্যার প্রাচীনতম নিদর্শন। ইহারও আগেকার কোন নিদর্শন এই পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। লার্ফিল্ড অনুমান করেন যে, তাহারো বহু পূর্ব্বে, হয়ত খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতকের শেষভাগে, মিলেটাস প্রদেশে অক্ষরসংখ্যার প্রথম প্রয়োগ হইয়া থাকিবে। কিন্তু কীল বলেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৫০—৪২৫ সালের মধ্যে হলিকর্ণসাসেই অক্ষর-সংখ্যার উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। কীল লার্ফিল্ডের যুক্তির দোষ প্রদর্শন করেন এবং ঐ বিষয়ে উভয় পণ্ডিতে বাদানুবাদও হয়। গ্রীক সভ্যতার জয়প্রচারক হীদ অবশ্য লার্ফিল্ডের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।[১] ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র বর্ণমালাস্থ অক্ষরের পৌর্ব্বাপর্য্য সমাবেশের বিচার করিয়াই লার্ফিল্ড প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ, গ্রীক অক্ষরসংখ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে ঐ প্রকারের অনুমান করিয়াছেন। তাঁহাদের কেহই প্রকৃত অক্ষরসংখ্যার অস্তিত্বের অপর কোন প্রকার প্রমাণ দিতে পারেন নাই। গাউ বলেন, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের প্রথম ভাগে আলেকজান্দ্রিয়াতেই যে অক্ষরসংখ্যার সৃষ্টি হয় ঐ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনি মনে করেন যে, গ্রীক অক্ষরসংখ্যার যতগুলি প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, সকলেই একযোগে এই পক্ষ সমর্থন করে।[২] যাহা হউক, আমরা দেখিতে পাই যে, গ্রীক অক্ষর-সংখ্যার উৎপত্তিকাল এখনো নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই।

অক্ষরসংখ্যার আবিষ্কারে প্রাচীন হিন্দুগণেরও যে দাবী থাকিতে পারে, এ কথা এ পর্য্যন্ত কাহারো মনে পড়ে নাই। আমরা দেখিয়াছি যে, পাণিনি অক্ষরসংখ্যার প্রয়োগ করিতেন। পাণিনির কাল সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ মতভেদ আছে। স্বর্গীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকারের মতে পাণিনি খৃষ্টের ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। অপরে তাঁহাকে দুই এক শত বৎসরের পরের লোক মনে করেন। পাণিনি ব্যাকরণে যখন অক্ষরসংখ্যার প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার প্রথম আবিষ্কার আরো পূর্ব্বে হওয়াই সম্ভব। যাহা হউক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, অক্ষরসংখ্যা ব্যবহারের প্রকৃত নিদর্শন ভারতবর্ষে গ্রীসেরও পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং অক্ষরসংখ্যার আবিষ্কার হিন্দুরাই প্রথম করিয়া থাকিবে। অন্ততপক্ষে এই কথা বলা যায় যে, ঐ বিষয়ে হিন্দুর দাবী কোন প্রকারে উপেক্ষণীয় নহে।

আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতে গ্রীক প্রভাবের কল্পনা

কেহ কেহ মনে করেন যে, আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীর পরিকল্পনায় গ্রীক প্রভাব বিদ্যমান ছিল। ১৮৯২ সালে স্বর্গীয় সুধাকর দ্বিবেদী মহাশয় এই মত প্রথম প্রকাশ করেন[৩]। ১৯০৭ সালে কে[৪] ও ১৯১১ সালে ফ্লীট[৫] ঐ মতের পুনরুল্লেখ করেন। অধ্যাপক শ্রীসারদাকান্ত গাঙ্গুলি মহাশয় বিশেষ দক্ষতার সহিত ইঁহাদের মতের সমালোচনা

১। হীদ-প্রণীত 'গ্রীকগণিতের ইতিহাস' দ্রষ্টব্য। গ্রীক অক্ষরসংখ্যার বিবরণ সংগ্রহ বিষয়ে আমরা হীদ ও গাউএর গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

হলিকর্ণসাস ও মিলেটাস গ্রীক অধিষ্ঠিত এশিয়া মাইনরের দুইটি সমীপবর্ত্তী প্রাচীন নগরী।

২। গাউ, 'গ্রীকগণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ৪৭—৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩। সুধাকর দ্বিবেদী, 'গণক-তরঙ্গিণী', ৫ পৃষ্ঠা।

৪। G. R. Kaye, *J.A.S.B*, III (1907), p. 478

৫। J. F. Fleet. loc. cit, p. 125.

ও খণ্ডন করিয়াছেন।[১] দ্বিবেদী ও কে তাঁহাদের ঐ প্রকার মতের সমর্থনে কোন যুক্তি দেন নাই। ফ্লীট বলেন যে, "আর্য্যভটীয়ে নিহিত জ্যোতিস্তত্ত্বের অধিকাংশ ভাগই গ্রীকদের নিকট হইতে পাওয়া বলিয়া যখন দেখিতে পাই, তখন তাঁহার গণনা-প্রণালীও সেই উপায়ে পাওয়ার সম্ভাবনা স্বতঃই মনে আসে।" আর্য্যভট তাঁহার জ্যোতিস্তত্ত্বের জন্য গ্রীকদের নিকট ঋণী কি না, সেই বিষয়ে মতদ্বৈধতা আছে। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় ঐ বিষয়ের গভীর আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন যে, আর্য্যভটের জ্যোতিষে গ্রীক জ্যোতিষের কোন প্রভাব নাই[২]। সে যাহা হউক, একমাত্র ঐ কারণেই আর্য্যভট অক্ষরসংখ্যা গ্রীকদের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন মনে করা ঠিক নহে। আমরা দেখিয়াছি যে, আর্য্যভটের সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে বৈয়াকরণ পাণিনি সংখ্যা নির্দ্দেশার্থ বর্ণমালার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। আর্য্যভট তাঁহার নিকট হইতেই সেই সঙ্কেত পাইয়া থাকিবেন। ঐ প্রকার মনে করিবার আরো বিশেষ কারণ এই যে, বর্ণমালা বিষয়ে আর্য্যভট সর্ব্বাংশে পাণিনিরই অনুসরণ করিয়াছেন। অবশ্য উভয়েই মূলে 'শিবসূত্রে'র নিকট ঋণী। তারপর আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা প্রণালীর তত্ত্ব গ্রীক অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর তত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গ্রীকেরা স্থানীয়মানতত্ত্ব জানিতেন না। আর্য্যভটপ্রণালী ঐ তত্ত্ব অবলম্বনেই বিবৃত। গ্রীকেরা যেমন বর্ণমালার প্রথম নয় অক্ষর দ্বারা ১ হইতে ৯ সংখ্যা, তৎপরের নয় অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে তাহাদের দশগুণ সংখ্যা, এবং পরের নয় অক্ষর দ্বারা যথাক্রমে উহাদের শতগুণ সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেন, আর্য্যভট সেই প্রকার করেন নাই। ইহা বুঝিতে পারিয়া ফ্লীট স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, গ্রীক ও হিন্দু প্রণালীর সাদৃশ্য ঐ স্থলে নহে, অন্যত্র। তিনি বলেন যে, গ্রীক অক্ষর-সংখ্যায় যেমন—

$\beta, \gamma, \delta =$ ২, ৩, ৪

এবং βM, γM, δM = ২ × ১০০০০, ৩ × ১০০০০, ৪ × ১০০০০

সেইরূপ আর্য্যভটের অক্ষরসংখ্যা-প্রণালীতেও—

খ্, গ্, ঘ্ = ২, ৩, ৪

এবং খু, গু, ঘু = খ্উ, গ্উ, ঘ্উ = ২ × ১০০০০, ৩ × ১০০০০, ৪ × ১০০০০

উভয় প্রণালীতে এই সাদৃশ্য আছে মনে করিয়া ফ্লীট কল্পনা করেন যে, আর্য্যভট তাঁহার অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর পরিকল্পনায় গ্রীক অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী হইতে কোন কোন সঙ্কেত গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তাঁহার এই যুক্তির অসারতা সহজে প্রতিপাদন করা যায়। প্রথমতঃ, আর্য্যভটের প্রণালীতে স্বরবর্ণের কোন প্রকার সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি ছিল না। তাহারা অঙ্কস্থান নির্দ্দেশ করিত মাত্র—ফ্লীট নিজেও যে এ কথা জানিতেন, তাহা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু উপরে প্রদর্শিত সাদৃশ্যে স্বরবর্ণের সংখ্যাজ্ঞাপিকা শক্তি আছে বলিয়া ধরা হইয়াছে। গ্রীকপ্রভাব প্রদর্শনের পূর্ব্বকৃত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ফ্লীট

১। Sarada Kanta Ganguli, loc. cit.

২। Prabodh Chandra Sen Gupta, *Aryabhata, the Father of Indian Epicyclic Astronomy* (reprinted from the Journal of the Department of Letters, Calcutta University, 1928).

অজ্ঞাতসারে আত্মবিরোধ করিয়া ফেলিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, ঐ সাদৃশ্য প্রকৃত নহে, একমাত্র বর্গীয় ব্যঞ্জনবর্ণ লইয়া বিচার করিলে কতকটা সাদৃশ্য আপাততঃ প্রতীয়মান হয় বটে। কিন্তু বর্গীয় ও অবর্গীয় উভয় প্রকারের ব্যঞ্জনবর্ণ মিশ্রিত করিয়া দেখিলে ঐ সাদৃশ্য দূরীভূত হয়। যথা,—

খ্, য্, ঘ্ = ২,৩, ৪

কিন্তু খু, যু, ঘু = ২০০০০, ৩০০০০০, ৪০০০০।

এই সকল কারণে আমরা ক্লীটের মত অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিতে পারি। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর পরিকল্পনায় কোন প্রকারের বিদেশী প্রভাব ছিল না।

অক্ষর-সংখ্যার প্রসার—গ্রীসে

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, গ্রীক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের বিশ্বাস মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ, কি সপ্তম শতকে গ্রীক অক্ষর-সংখ্যার আবিষ্কার হইলেও তাহার প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায়—খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের আদিতে হলিকর্ণসাস নামক স্থানে। তৎপরবর্ত্তী নিদর্শন ঐ শতকের মধ্য সময়েব। তাহাব কোন কোনটা হলিকর্ণসাসে, একটা এথেন্সের। কিন্তু সাধারণের মধ্যে অক্ষর-সংখ্যার প্রচার হইতে কয়েক শ' বছর লাগিয়াছিল। রাজকীয় তরফ হইতে উহার ব্যবহারের প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় দ্বিতীয় টলেমির (ফিলাডেল্ফাস) নামাঙ্কিত মুদ্রায়। ইনি ২৭৬ খৃষ্টপূর্ব্ব সালে আলেকজান্দ্রিয়ায় রাজত্ব করিতেন। এথেন্স নগরীতে খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতকেও লোকে প্রাচীন এট্টিক প্রণালী মতে সংখ্যা লিখিত দেখা যায়। ঐ শতকেব মধ্যভাগে তথাকার রাজা অগষ্টাস সর্ব্বপ্রথমে অক্ষর-সংখ্যার প্রচলন আরম্ভ করেন। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ কর্ত্তৃক উহা স্বীকার করিয়া লইতে এক শ বছর লাগিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতকের মধ্যভাগে এট্টিক প্রণালীর ব্যবহার এথেন্সের জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়। গ্রীসের বোয়েসিয়া প্রদেশে ২০০ খৃষ্টপূর্ব্ব সালে উভয় প্রণালীই সমভাবে ব্যবহৃত হইত দেখা যায়। এতৎসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সুপ্রণালীবদ্ধ অক্ষর-সংখ্যার আবিষ্কারের পরেও সকলে আদিম প্রণালীর পরিত্যাগ সহজে করে নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকের গোড়ায় বিশেষভাবে হস্তলিখিত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে আদিম প্রণালীর ব্যবহার দৃষ্ট হয়। গ্রীকগণ প্রথম প্রথম পাটীগণিতে অক্ষর-সংখ্যার ব্যবহার করিতেন না বোধ হয়। কিন্তু পরে গণিতেও তাহার ব্যবহার হইত। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ইয়ুটোসিয়াস নামক জনৈক বিখ্যাত টীকাকার যোগ, বিয়োগ, পূরণ ও ভাগ প্রভৃতি সকল পরিকর্ম্মই অক্ষর-সংখ্যার সহায়ে করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে

ভারতবর্ষে বৈয়াকরণশ্রেষ্ঠ পাণিনি ৭০০ খৃষ্টপূর্ব্ব সালেরও আগে অক্ষর-সংখ্যার ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার পরে অপর কেহ তাহা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ নাই। অপর পক্ষে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি লিখিয়াছেন যে, ঐ প্রকারে সংখ্যা নির্দ্দেশ প্রণালী পাণিনিরই বৈশিষ্ট্য। অতঃপর অক্ষর-সংখ্যার প্রয়োগ দেখা

যায় প্রথম আর্য্যভটের গ্রন্থে,—৪৯৯ সালে। আর্য্যভটের গ্রন্থ হইতে ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ সাল) যে সকল শ্লোকাংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোন কোনটাতে সংখ্যা-বাক্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু কোন পরবর্ত্তী গ্রন্থকার কর্ত্তৃক আর্য্যভটের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালী অনুসৃত হইয়াছে বলিয়া প্রমাণ নাই। এমন কি, লল্ল, ভাস্কর (আদি) প্রভৃতি আর্য্যভটের শিষ্যমণ্ডলীও তাহা গ্রহণ করেন নাই। টীকাকার সূর্য্যদেব যজ্বা ত কটপযাদি প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রকার কটপযাদি প্রণালীর প্রথম বিভেদের ব্যবহারও 'মহাসিদ্ধান্ত' ছাড়া অন্যত্র দৃষ্ট হয় না। ১৬৩৫ সালে মুনীশ্বর 'সিদ্ধান্তশিরোমণি'র স্বকৃত 'মরীচি' নামক টীকায় দ্বিতীয় আর্য্যভটের মূল শ্লোক ও তাঁহার প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন দেখা যায়। কিন্তু উহার ব্যবহার কুত্রাপি করেন নাই। ঐ প্রণালীর অপরাপর বিভেদের ব্যবহার অল্পবহুল অন্যত্র দৃষ্ট হয়। মালাবার, ত্রিবাঙ্কুর ও দক্ষিণ-তামিল প্রদেশে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল প্রমাণও অর্ব্বাচীন কালের। আরো একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে হস্তলিখিত গ্রন্থের পত্রাঙ্ক নির্দ্দেশ করিতে অক্ষর-সংখ্যার বহুল প্রচার থাকিলেও তাহাদের প্রণালী সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের[১]। জ্যোতিষ-গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রণালীর সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই। আরো একটা বিশেষ কথা এই যে, হিন্দুর পাটীগণিতে অক্ষর-সংখ্যার ব্যবহার কখনো হয় নাই। কোন আর্য্যভটই তাঁহাদের গ্রন্থের পাটীগণিত ভাগে অক্ষর-সংখ্যার প্রয়োগ করেন নাই; জ্যোতিষ-ভাগে করিয়াছেন মাত্র। ইহাতে অনুমিত হয় যে, সংখ্যাজ্ঞাপনের সরল ও সহজ অপর কোন পদ্ধতি তাঁহাদের জানা ছিল। গ্রীসদেশে অক্ষর-সংখ্যার প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল দেখা যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে সময়ে সময়ে নব নব প্রণালীর আবিষ্কার হইলেও কোন প্রণালীই বেশী কাল প্রচলিত ছিল না। কোন কোনটা ত আবিষ্কর্ত্তার সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রকার লুপ্ত বা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। একমাত্র কটপযাদি দ্বিতীয় বিভেদের প্রচলন কিছুকাল ছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতক হইতে পঞ্চদশ শতক পর্য্যন্ত তাহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল প্রমাণ সংখ্যায় অতি অল্প। ইহাতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষে অক্ষর-সংখ্যার আবিষ্কার সংখ্যা নির্দ্দেশের সহজ ও সুদৃঢ় প্রণালীর অভাব হেতু হয় নাই, অন্য কারণে হইয়াছিল[২]।

প্রাচীন লেখাদিতে কটপযাদি প্রণালীর দ্বিতীয় বিভেদের নিম্নলিখিত প্রমাণ পাওয়া যায়,—

'রাঘবায়' — ১৪৪২ (এপিঃ ইণ্ডিঃ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা)।
'তত্ত্বালোক' — ১৩৪৬ (ঐ, ৩।৪০)
'শক্ত্যালোক' — ১১১৫ (ঐ, ৩।২২৯)

১। সমুচিততম উপায়ে সংখ্যা নির্দ্দেশ ঐ সকল প্রণালী মতে হইতে পারে। উহাতে একাক্ষর দ্বারা বৃহৎ সংখ্যা নির্দ্দেশ করা যায়। কিন্তু আর্য্যভট-প্রণালী বা কটপযাদি-প্রণালী মতে সেই সকল সংখ্যা দ্ব্যক্ষর বা ত্র্যক্ষর বাক্যের দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে হইত। অবশ্য এই দুইটির অন্য অনেক উপযোগিতা আছে, যাহা ঐ সকল প্রণালীতে নাই। ২। পরে দ্রষ্টব্য।

'ভবতি' =৬৪৪ (ইণ্ডিঃ এণ্টিঃ, ২।৩৬০)
'রাকালোক' =১৩১২ (ঐ ২।৩৬১)
'বিশতি' =৬৫৪ (ঐ, ঐ)

এ সকল খৃষ্টীয় ১৪শ ও ১৫শ শতকের প্রমাণ। তাহারও আগেকার কোন শিলালেখে বা তাম্রলেখে এই পর্য্যন্ত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

সংখ্যাপ্রণালী বিষয়ে কতিপয় সিদ্ধান্ত

অক্ষরসংখ্যার উৎপত্তি, তাহার ক্রমবিবর্ত্তন ও জনসাধারণের মধ্যে তাহার ক্রম-বিস্তার সম্বন্ধে আমরা, গ্রীসে ও ভারতবর্ষে, যে সকল বিষয় উপরে লক্ষ্য করিয়াছি, অপর যে কোন সংখ্যাপ্রণালী সম্পর্কেও তাহা ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। আমরা অন্যত্র দেখিয়াছি যে, ভারতবর্ষে শব্দসংখ্যা-প্রণালী সম্পর্কে তাহা বস্তুতই ঘটিয়াছিল[১]। শব্দসংখ্যার প্রকৃত উৎপত্তি বৈদিক কালে হইলেও খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতকের পূর্ব্বে তাহাতে স্থানীয়-মানের অবতারণা হয় নাই। তখনও লোকসমাজে তাহার প্রচলন খুবই কম ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতক হইতে বিশেষতঃ জ্যোতিষ-গ্রন্থাদিতে তাহার বহুল ব্যবহার দেখা যায়। এবং পরবর্ত্তী কালেও তাহা সমভাবে চলিয়াছিল। খৃষ্টীয় নবম শতকের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন শিলালেখে তাহার ব্যবহার দেখা যায় না। এই সকল বিষয়ে গভীর বিচার করিয়া আমরা সংখ্যা-প্রণালীর উৎপত্তিকাল ও ক্রমবিবর্ত্তন প্রভৃতি বিষয়ে দুইটি স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি। প্রথমতঃ কোন দেশের অংশবিশেষে কোন কালে কোন বিশিষ্ট প্রকার সংখ্যালিখন-প্রণালীর প্রয়োগ দেখিয়া, সেই দেশের সর্ব্বাংশে সেই কালে সেই প্রকার সংখ্যা-প্রণালী ব্যবহার হইত মনে করা ভুল। দ্বিতীয়তঃ শিলালেখ ও তাম্রলেখ ইত্যাদিতে ব্যবহৃত প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া কোন বিশিষ্ট সংখ্যাপ্রণালীর উৎপত্তিকাল ও ক্রমবিবর্ত্তনপ্রথা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। গাউ সত্যই বলিয়াছেন যে, জনসাধারণের জন্য প্রচারিত লেখগুলিতে বিদ্বজ্জনবোধ্য কোন নবাবিষ্কৃত সংখ্যাপ্রণালীর প্রথম ব্যবহার কিছুতেই হইতে পারে না।[২] দৃষ্টান্ত-স্বরূপে বলা যায় যে, গ্রীস দেশে ঃ (৯০০) চিহ্নের প্রয়োগ খৃষ্টীয় ১৩শ, কি ১৪শ শতকের আগেকার লেখে পাওয়া যায় না। ভারতবর্ষে আমরা আরো একটা তত্ত্ব লক্ষ্য করি। এ দেশে ভিন্ন ভিন্ন কাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সংখ্যাপ্রণালীর প্রয়োগ হইত। এমন কি, একই পুস্তকের বিভিন্ন ভাগে বিভিন্ন সংখ্যাপ্রণালীর ব্যবহারও দেখা যায়। অবশ্য অঙ্কের রূপ ও আকৃতি প্রভৃতি বিচার করিতে গেলে প্রাচীন লেখ প্রভৃতির উপর নির্ভর করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও মনে রাখা উচিত যে, দেশের বিভিন্ন অংশে একই কালে অঙ্কের রূপ বিভিন্ন হইতে পারে। খৃষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম ভাগে সুপ্রসিদ্ধ আরবী পর্য্যটক আলবিরুণী লিখিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের

১। শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত, 'শব্দসংখ্যালিখন-প্রণালী', সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ।

২। গাউ, 'গ্রীক গণিতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস', ৪৬ পৃষ্ঠা।

বর্ণমালা যেমন পৃথক্, অঙ্কের রূপও তেমন পৃথক্।[১] সুতরাং ইহা সহজেই বোধগম্য হইবে যে, হিন্দু-দশমিক-প্রণালীর উৎপত্তিকাল ও প্রসারের বিচার করিতে গিয়া যাঁহারা একমাত্র প্রাচীন লেখমালার প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কিছুতেই প্রকৃত তথ্য ধরিতে পারিবেন না। ইহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য।

অর্থযুক্ত সংখ্যাবাক্য

আমরা এই পর্য্যন্ত যেই সকল সংখ্যাবোধক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছি, কি ভারতীয়, কি গ্রীক, ভাষার দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, তাহারা অর্থহীন। কিন্তু সময় সময় দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে অর্থযুক্ত ও নীতিপূর্ণ বাক্যও সংখ্যা-খ্যাপনার্থ প্রযুক্ত হইত। এই প্রকারে উভয় দিক্ রক্ষা করিয়া চলা কম কৃতিত্বের কথা নহে। মক্কিভট্টের গ্রন্থ (১৩৭৭ সাল) হইতে আমরা ঐ প্রকারের কতগুলি উদাহরণ দিতেছি[২],—

'জ্ঞানেন শ্রীলাভ' = ৪৩২০০০

জ্ঞানিনো বিত্তদা = ৮৬৪০০০

জ্ঞানী নীতিধারক = ১২৯৬০০০

জ্ঞানী নির্জ্জরৈ সেব্য = ১৭২৮০০০

অল্পজ্ঞো ভাবুক = ১৪৪০০০

জ্ঞানী সুনং ভীষ্মক = ১৫৪০০০০

জ্ঞানী সুনং শ্রীধর্ম্মবাড্ = ২৫৯২০০০০

জ্ঞানী সুনং শিবস্তর্কধীসামর্থ্যমান্য = ১৫৮২২৩৬৪৫০০০

দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চী সহরে অরুতলপেরুমল দেবমন্দিরে প্রাপ্ত একখানি খোদিত লিপিতে আছে যে, কেরলরাজ সংগ্রামধীর রবিবর্ম্মা 'দেহব্যাপ্য' অর্থাৎ ১১৮৮ শকে দেহ ধারণ করিয়াছিলেন[৩]। 'জৈমিনীয় সূত্রে'ও এই প্রকারের বহু বাক্য আছে। যথা - 'দার' = ২৮; 'ভাগ্য' = ১৪, 'শূল' = ৩৫, 'কাম' = ৫১; 'শান্ত' = ৬৫; ইত্যাদি। সূর্য্যদেব যজ্বার প্রযুক্ত কোন কোন সংখ্যাবাক্যেও এইরূপ অর্থ পাওয়া যায়।[৪] যথা—'শরীর' = ২২৫, 'পুত্রবল' = ৩৩২১, 'শূরক্ষমীশঙ্কর' = ২১৫৫৬২৫, 'মিত্রকুলধাবকলোক' = ১৩১৪৮৩১২৫, ইত্যাদি।

গিমাত্রিয়

ইহুদীগণের মধ্যে অক্ষরসংখ্যার আর এক প্রকার ব্যবহার হইত। তাহাকে 'গিমাত্রিয়' বলে। কোন বাক্য, পদ বা পঙ্‌ক্তিতে ব্যবহৃত অক্ষরনির্দ্দিষ্ট সংখ্যার যোগ করিলে, ফলে যে সংখ্যা পাওয়া যাইত, তাহাকে ঐ বাক্য, পদ বা পঙ্‌ক্তির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করা হইত। লোকে রহস্য গোপন বা যাদুর জন্য ইহার বিশেষ ব্যবহার করিত। বাইবেলে প্রত্যেক উপাসনার পর 'আমেন' (amen) উচ্চারণ করার বিধি আছে। উহাকে

১। *Alberuni's India* I, p. 174.

২। শ্রীপতির 'সিদ্ধান্তশেখরে'র উপর মক্কিভট্টের টীকা। ১ম অধ্যায়, ১৩ - ৪০ শ্লোক।

৩। *Epigraphia Indica*, vii. Appendix, p. 939.

৪। ভটপ্রকাশিকা, ২।১০,৩২

গ্রীক্ অক্ষরে লিখিয়া তাহার সংখ্যা গণনা করিলে ৯৯ হয় ($\alpha\mu\eta\nu$ = ১ + ৪০ + ৮ + ৫০ = ৯৯)। তাই কোন কোন খৃষ্টীয় পাণ্ডুলিপিতে 'আমেনে'র পরিবর্ত্তে ৯৯ লেখা থাকিত দেখা যায়। কোন একটা সংখ্যা দেখিয়া তদ্বোধিত বাক্যের রহস্যোদ্ঘাটন করা সহজ নয়। কখন কখন তাহা অসম্ভব হইত। আবার উহা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতভেদও হইত। বাইবেলের এক স্থলে আছে, "এখানেই বুদ্ধি। যাহার বোধশক্তি আছে, সে পশুর সংখ্যা গণনা করুক; কারণ, উহা লোকবিশেষের সংখ্যার সমান, এবং তাহার সংখ্যা ছয় শত তিন কুড়ি আর ছয়।"[১] এ স্থলে ৬৬৬ সংখ্যার দ্বারা যে কাহাকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহার রহস্যোদ্ঘাটন করিবার জন্য দু হাজার বছর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও কোন ফল হয় নাই। বিভিন্ন লোকে উহার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছে।[২] দুইটা বাক্য, পদ বা পঙ্ক্তির সংখ্যা গণনা করিলে যদি একই ফল পাওয়া যায়, তবে ঐ দুইটা বাক্য, পদ বা পঙ্ক্তি সমান বলিয়া ধরা হইত এবং তাহাদের একটার পরিবর্ত্তে অপরটা ব্যবহৃত হইত। ঐ সকল স্থলে আপাতপ্রতীয়মান অর্থ গ্রহণ করিলে যে প্রমাদ ঘটিবে, তাহা সহজেই বোঝা যাইবে। সুপ্রসিদ্ধ আরবী পর্য্যটক আল্-বেরুণী তাঁহার 'অথার-উল-বাকির' নামক গ্রন্থে এই প্রকারের কতিপয় দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] তাহাতে দেখা যায় যে, মুসলমানদিগের মধ্যেও এই প্রকারের রহস্যপূর্ণ লিখনপ্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল।

গণনাবর্ত্তলিপি

হিন্দুদিগের মধ্যে 'গিমাত্রিয়' প্রথার প্রচলন ছিল বলিয়া কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। কখন কখন মনে হয় যে, উহার কিছু না কিছু থাকিবার সম্ভাবনা। 'ললিতবিস্তরে'[৪] যে চৌষট্টি প্রকার লিপির উল্লেখ আছে, তাহার একটার নাম 'গণনাবর্ত্তলিপি'। গণনার ভিতর দিয়া আবর্ত্তন করিয়া যাহার অর্থসঙ্গতি করিতে হয়, তাহাই গণনাবর্ত্তলিপিতে লেখা বাক্য।

অক্ষর-সংখ্যার উপযোগিতা

অক্ষর-সংখ্যার উপযোগিতা কি? উহা নিশ্চয়ই সংখ্যা লিখিবার জন্য হিন্দু দশমিক প্রণালী অপেক্ষা নিকৃষ্ট। স্বল্পতমসংখ্যক চিহ্ন দ্বারা যে কোন বৃহৎ সংখ্যা প্রকাশের এমন সহজ ও সুন্দর উপায় আর নাই। আর্য্যভট বা অপর অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি যখন তাঁহাদের অক্ষর-সংখ্যা-প্রণালীর উদ্ভাবন করিতেছিলেন, তখনও দশমিক প্রণালী ও স্থানীয়মান-তত্ত্ব হিন্দুদের পরিজ্ঞাত ছিল। তবুও কেন তাঁহারা এই অভিনব প্রণালীর উদ্ভাবন করিলেন, এই প্রশ্ন স্বতঃই জাগে। মনে হয় যে, কোন বিশেষ উপযোগী কারণবশতঃই নূতন প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছিল। শব্দসংখ্যার উপযোগিতা বিষয়ে পূর্ব্বে আমি যাহা যাহা বলিয়া-

১। *Revelation* xiii. 18

২। See D. E. Smith, *History of Mathematics*, II, p. 54.

৩। এই গ্রন্থের আরবী মূল (Edward Sachau, *Chronologie Orientalischer Volker von Alberuni*, Leipzig, 1878) and ইংরাজী ভাষান্তর (C. Edward Sachau, *The Chronology of Ancient Nations*, London, 1879) দুইই ছাপা হইয়াছে। ভাষান্তরের ১৮ পৃষ্ঠা হইতে দ্রষ্টব্য।

৪। ললিতবিস্তর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত, ১০ম অধ্যায়।

ছিলাম,[১] অক্ষর-সংখ্যার পক্ষেও তাহা খাটে। প্রথমতঃ অক্ষর-সংখ্যার দ্বারা কোন বৃহৎ সংখ্যা সঙ্কুচিত ভাবে প্রকাশ করা যায়। আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। এ বিষয়ে আর্য্যভটপ্রণালী সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ উপযোগী। গাউ[২] মনে করেন, গ্রীক অক্ষর সংখ্যার সৃষ্টিরও উহাই একমাত্র কারণ। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতকের তৃতীয় ভাগে আলেকজান্দ্রিয়াবাসী গ্রীকগণের মধ্যে সঙ্কুচিত ভাবে সংখ্যালিখনের উপায় উদ্ভাবনের একটা বিশেষ প্রচেষ্টা হইয়াছিল। ঐ সময়েই আর্কিমিডিস ও এপোলোনিয়স তাঁহাদের অভিনব সংখ্যালিখন-প্রণালী উদ্ভাবন করেন। ভারতবর্ষে অক্ষর-সংখ্যার আরো একটা উপযোগিতা ছিল। একই সংখ্যাকে ইচ্ছামত বিভিন্ন উপায়ে প্রকাশ করিতে পারিলে ছন্দোবন্ধন খুবই সুন্দর হয়। এই বিষয়ে কটপযাদি প্রণালী যে আর্য্যভট-প্রণালী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রহস্য ও সাঙ্কেতিক লেখার জন্যও অক্ষর-সংখ্যার প্রয়োগ হইত দেখা যায়।

শ্রীবিভূতিভূষণ দত্ত

১। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ, ৮—৯ পৃষ্ঠা।
২। Gow, *Short History of Greek Mathematics*, pp. 48, 60 ff.

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান ও কবিশেখরের কালিকা-মঙ্গল*

ভারতের কথা-সাহিত্য অতি বিস্তৃত ও প্রাচীন। বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলির মধ্যে অনেক উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ জাতক এবং হিন্দু ও জৈন পুরাণগুলি এইরূপ উপাখ্যানের আকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উদয়ন ও বাসবদত্তার উপাখ্যান প্রাচীন ভারতের কাব্যসাহিত্যকে বিশেষ সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। কালিদাসের সময়ে গ্রামবৃদ্ধেরা পর্য্যন্ত এই উদয়নের গল্প আলোচনায় মুগ্ধ ও ব্যস্ত থাকিতেন। তারপর প্রাদেশিক ভাষায় রচিত মাণিকচন্দ্র রাজার গানগুলি এক সময় সমস্ত ভারতের জনসাধারণকে পরিতৃপ্ত করিত।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কথা-সাহিত্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও নানা দেবদেবী পূজার মধ্য দিয়া এই কথাসাহিত্য মধ্যযুগে একসঙ্গে বাঙ্গালীর তৃপ্তি-সাধন ও ধর্ম্মোন্নতি-বিধান করিত। বেহুলা, ফুল্লরা, শ্রীমন্ত, বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতির মনোহর উপাখ্যান প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত ছিল।

বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানের প্রাচীনতা ও বিস্তার

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানেরই আলোচনা করিব। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান কত প্রাচীন, তাহা বলিতে পারা যায় না। অবশ্য সংস্কৃত ভাষায়ও এই উপাখ্যান নিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত হইলেই যে প্রাচীন হইবে, এরূপ বলা যায় না। সুতরাং কেবল ভাষার প্রমাণে সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরকে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল বলিয়া নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত নহে। একাধিক বাঙ্গালা উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া আধুনিক যুগেও সংস্কৃতকাব্য রচিত হইয়াছে, এরূপ প্রমাণ দুর্লভ নহে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী কলেজের অধ্যাপক ভগবচ্চন্দ্র বিশারদ মহাশয় বেহুলা লখিন্দরের উপাখ্যান লইয়া এক চম্পূকাব্য রচনা করেন। ১৯০৭ সালে শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ কাব্যতীর্থ 'বিদ্যোদয়' পত্রিকায় বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানকে নাটকাকারে পরিণত করেন। অপেক্ষাকৃত প্রাচীন যুগেও যে এইরূপ হয় নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে ২।১ স্থলে সংস্কৃতে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান পাওয়া গিয়াছে—সেই সকলগুলির রচয়িতা বা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা যায় না। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানটী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে[১]। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় সংগৃহীত (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত) কাব্য-সংগ্রহ গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দরের এক খণ্ডিত উপাখ্যান মুদ্রিত হইয়াছে। উহাতে সুন্দর

---

* ১৩৩৬, ৯ই আষাঢ় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। History of Bengali Language and Literature—পৃ. ৬৪৪ ; তবে বোম্বাই Venkateswar Steam Machine Press হইতে প্রকাশিত এই গ্রন্থের সংস্করণে এই উপাখ্যানটী পাওয়া যায় না।

কর্ত্তৃক বিদ্যার অনুরোধ, উপভোগ ও সুন্দরের দণ্ডের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাতে মাত্র ৫৪টী শ্লোক আছে। এইটী স্পষ্টতই অসম্পূর্ণ। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বররুচি কর্ত্তৃক সংস্কৃতে প্রথম রচিত হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। স্বর্গত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গ-ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাবে' এই প্রসিদ্ধির উল্লেখ করিয়াছেন। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম বর্ষে (১২৭৯ সাল) রামদাস সেন লিখিত বররুচির সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ প্রবন্ধে (৪৭৩ পৃঃ) কলিকাতা প্রাকৃত যন্ত্র হইতে প্রকাশিত সংস্কৃত ব্যাখ্যা সহিত বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থ উল্লিখিত হইয়াছে। সম্প্রতি বররুচিকৃত গ্রন্থের এক পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে পুথির উপর নির্ভর করিয়া অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন ও বিদ্যাসুন্দর-বিষয়ক বিবিধ গ্রন্থের মধ্যে ইহার স্থান নির্ণয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের মূল[১]। ইহার কতকগুলি শ্লোক কাব্যসংগ্রহে প্রকাশিত বিদ্যাসুন্দরে পাওয়া যায়।

ইহা ছাড়া, অন্য কোন কোনও ভাষায়ও বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানমূলক নূতন ও পুরাতন গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। ডক্টর শ্রীযুক্ত রায় দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর লিখিয়াছেন,—'বহু প্রাচীন ফার্সীতে রচিত একখানি প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর আমরা দেখিয়াছি। উহা ভারতচন্দ্রের অনেক পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল[২]।' ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা বিদ্যাসুন্দর উর্দ্দুতে অনূদিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। ২০০ শত বৎসর পূর্ব্বে কাশীনাথ নামে এক কবি বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া মৈথিল ভাষায় 'বিদ্যাবিলাপ' নামে এক নাটক লেখেন[৩]। নাটক বলিতে আমরা যাহা বুঝি, ইহা ঠিক সেই ধরণে লেখা নহে। তবে ইহাতে অঙ্কভাগ আছে। এক একজন পাত্র প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিচয় ও বক্তব্য বলিয়া যাইতেছেন—এই ধরণে পুস্তকখানি লেখা। ইহার মধ্যে দুইটী বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথম—ইহাতে বিদ্যা ও সুন্দরের গৃহে যাতায়াতের সুড়ঙ্গের কোনও উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়তঃ—গ্রন্থের প্রারম্ভে পূজাপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যে চণ্ডিকা প্রবেশ করিতেছেন এবং স্পষ্টই বলিতেছেন,—

পরকট ভয় হমে পুরাওব কামে।
পূজাবলি লেব মোয় জায় ওহি থানে ॥—(পৃঃ ৪)

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কোটাল কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া সুন্দর যখন বীরসিংহের সমীপে নীত হইল, তখন সে কালিকার স্তুতি আরম্ভ না করিয়া নারায়ণের নিকট এই প্রার্থনা করিল :—

১। The Long-lost Sanskrit Vidyasundara—Proceedings of the Second Oriental Conference—পৃঃ—২১৫—২২০।

২। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—৫ম সংস্করণ—পৃঃ ৪৭৭।

৩। নেপালে বাঙ্গালা নাটক—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌গ্রন্থমালা। সম্পাদক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যাবিলাপকে বাঙ্গালা বলিয়াছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে ইহার মধ্যে প্রকাশিত পুস্তকগুলির মধ্যে একমাত্র রামচরিতখানি বাঙ্গালা।

লক্ষ্মীশ পন্নগকুলান্তকপৃষ্ঠচারিন্
দেবারিমর্দ্দন জনার্দ্দন বিশ্ববন্দ্য।
মামদ্য পাহি শরণাগতদীনবন্ধো
দুঃখাম্বুধৌ নিপতিতং কৃপয়া সুরেশ ॥—(পৃঃ ৩০)

একাধিক বঙ্গীয় কবি এই বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সকলগুলিই যে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট এবং জনসাধারণের সুপরিচিত বা সমাদৃত, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে বিভিন্ন কবির হাতে পড়িয়া এই উপাখ্যান কালক্রমে কোন অংশে কোনরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে তাহা কিরূপ—এই সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য এই কাব্যসমূহের সম্যক্ আলোচনার প্রয়োজন। তাহা ছাড়া বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের প্রকার অনুসরণ করিবার জন্যও এগুলি বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। বাঙ্গালায় যতগুলি বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত ভারতচন্দ্রের পুস্তক। কিছু দিন পূর্ব্বেও এই গ্রন্থ সাদরে পঠিত হইত। অনেক স্থল গ্রাম্যতা-দোষদুষ্ট হওয়ায় বর্ত্তমানে এই গ্রন্থের আদর অনেক কমিয়া গিয়াছে। তবে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বে ও পরে বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশে নানা কবি এই উপাখ্যান লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন। এ পর্য্যন্ত যে সকল কবির রচিত বিদ্যাসুন্দর পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

(১) **কঙ্ক**—চৈতন্যের সমকালবর্ত্তী। ইনি ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন[১]।

(২) **গোবিন্দদাস**—ইনি চট্টগ্রামের লোক। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত ইঁহার কালিকা-মঙ্গল গ্রন্থের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান রহিয়াছে[২]।

(৩) **কৃষ্ণরামদাস**—[৩] নিমতাগ্রামবাসী কৃষ্ণরামদাস ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। পূজনীয় মহামহোপাধ্যায় ডক্টর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। (সাহিত্য ১৩০০)

(৪) **মধুসূদন কবীন্দ্র**[৩]—(৫) **ক্ষেমানন্দ**[৩]—এই দুই জনের রচিত গ্রন্থের সময় নির্দ্ধারিত হয় নাই।

(৬) **বলরাম কবিশেখর**—ইঁহার কাব্যই বর্ত্তমান প্রবন্ধে প্রধানতঃ আলোচিত হইবে। ইঁহার নির্দ্দিষ্ট সময় জানা না গেলেও ইঁহার ভাষা ও রচনা দৃষ্টে ইঁহাকে রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

(৭) **রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন**-সুপ্রসিদ্ধ রামপ্রসাদী সঙ্গীতের রচয়িতা, বিখ্যাত কালীভক্ত রামপ্রসাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বীয় বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন[৪]।

(৮) **ভারতচন্দ্র রায় কবিগুণাকর**—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্

১। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৫ম সংস্করণ) পৃঃ ৪৮১। ২। ঐ ঐ।

৩। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন প্রণীত—*History of Bengali Language and Literature*—পৃঃ ৬২৬।

৪। প্রাচীন কবি-গ্রন্থাবলী—বসুমতী কার্য্যালয়।

বঙ্গের বৃদ্ধসম্প্রদায়ে আজ পর্য্যন্ত সুপরিচিত ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে অন্নদামঙ্গল নামে কাব্য রচনা করেন। তাহারই মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে[১]।

(৯) **প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী**—ইনি ভারতচন্দ্রের পরে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান অবলম্বনে যে গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে কৃষ্ণরামদাস, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের গ্রন্থের উল্লেখ আছে[২]।

(১০) **বিশ্বেশ্বর দাস**—ইঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরের একখানি পুথি বীরভূমের শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র মহাশয়ের রতন লাইব্রেরীতে আছে।

(১১) **গোপাল উড়ে**—বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান কালক্রমে যাত্রার আকার ধারণ করিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া বহু যাত্রার পালা রচিত হইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে গোপাল উড়ের পুস্তকই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে[৩]।

কবিশেখরের সময় ও পরিচয়

গ্রন্থের মধ্যে ভণিতায় শ্রীকবিশেখর (৮২খ, ৮১ক, ৫৭খ, ৫১খ, ১৮ক, ১৯ক), অথবা দ্বিজ বলরাম (৬১খ, ৫৩খ, ৪৩খ, ৩৪ক, ৩২ক, ৩৬ক, ইত্যাদি) এই নাম পাওয়া যায়। এক স্থলে বলরাম চক্রবর্ত্তী, এই পূর্ণ নাম উল্লিখিত হইয়াছে।

বলরাম চক্রবর্ত্তি মাগে তব পদে ভক্তি
কর প্রভু কৃপাবলোকন।—(২ক)

সুতরাং ইঁহার পূর্ণ নাম বলরাম চক্রবর্ত্তী এবং উপাধি কবিশেখর ছিল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। গ্রন্থমধ্যে এক স্থলে ইঁহার একটু পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,—

পিতামহ চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য
জনক আচার্য্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চনী নাম তার সুত বলরাম
কালিকা পুরিল যার আস॥—(৫২ক)

এই সামান্য পরিচয় হইতে ইঁহার কালনির্ণয় করিবার কোনও সুবিধা হয় না। কবিশেখর উপাধিটী অপরিচিত নহে। প্রাচীন বাঙ্গালা ও সংস্কৃত-সাহিত্যে এই উপাধি-ধারী আরও কয়েকজন কবির নাম ও গ্রন্থ পাওয়া যায়। বিদ্যাপতির কবিশেখর উপাধি ছিল। তাঁহার কোন কোন গানের ভণিতায় কবিশেখর অথবা নব-কবিশেখর, এই নাম পাওয়া যায়। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদে 'শঠভাবোদয়' নামক প্রহসনের একখানি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে। উহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ঐ গ্রন্থখানি কৃষ্ণানন্দাচার্য্য কবিশেখর-রচিত। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীতে ও বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে

১। প্রাচীন কবি-গ্রন্থাবলী—বসুমতী কার্য্যালয়।
২। *History of Bengali Language and Literature*—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—পৃঃ ৬৭৮।
৩। ১৯ বৃন্দাবন বসাকের লেন হইতে শ্রীমহেন্দ্রনাথ কর কর্তৃক প্রকাশিত।

গোপাল-বিজয় নামে একখানি বাঙ্গালা পুথি আছে। ইহার রচয়িতা চতুর্ভুজনাথের পুত্র কবিশেখর। এই গোপাল-বিজয় গ্রন্থের প্রারম্ভেই ইহার রচিত গোপালচরিত মহাকাব্য ও গোপীনাথবিজয় নাটকের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থের অনুবাদকদিগের মধ্যে এক কবিশেখরের নাম পাওয়া যায়[১]।

সুতরাং এই কবিশেখর উপাধি হইতেও বর্ত্তমান গ্রন্থকারের সময় সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। তবে তাঁহার কালিকামঙ্গলের ভাষা দেখিয়া মনে হয়, তিনি নিতান্ত আধুনিক নহেন। তাঁহার উপাখ্যানাংশেও কিছু কিছু প্রাচীনত্ব আছে। আপাততঃ তাঁহাকে রামপ্রসাদের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অবশ্য ভারতচন্দ্রের পরবর্ত্তী প্রাণারাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার রচিত বিদ্যাসুন্দরের মধ্যে যে যে প্রাচীন বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতার নাম দিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কবিশেখরের নাম নাই। কিন্তু তাহা হইতে কবিশেখরের সময় সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না। মনে হয়, প্রাণারাম পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর কাব্যগুলিই জানিতেন এবং তাহাদের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তাই, তাঁহার গ্রন্থে মৈমনসিংহের কঙ্ক ও চট্টগ্রামের গোবিন্দদাসের কাব্যেরও কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। আমাদের কবিশেখরকেও পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থানে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দাদি ব্যবহৃত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়।

কালিকামঙ্গলের পুথি

ইহার একখানি পুথি কলিকাতা সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা পুথির বিবরণ প্রস্তুত করিবার সময় আমার দৃষ্টিগোচর হয়। কিছুদিন পরে সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের অন্যান্য বাঙ্গালা পুথির সহিত ইহার এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৩৪শ খণ্ড, পৃঃ ২২৫—২৬) প্রকাশ করি। পুথিখানি জীর্ণ, সাদা দেশী কাগজে বড় বড় পরিষ্কার অক্ষরে এক পৃষ্ঠে লেখা। দুইখানি পাতা এক সঙ্গে জোড়া—মাঝখানে ভাজ করা। পুথিখানি অসম্পূর্ণ—শেষের দিকে বোধ হয় একখানা পাতা নাই। সর্ব্বসমেত ইহার পত্রসংখ্যা ৬৩। হস্তাক্ষর খুব প্রাচীন না হইলেও খুব আধুনিক নহে—অনেকগুলি অধুনা অপ্রচলিত 'ছাঁদের অক্ষর' দেখিতে পাওয়া যায়। মু, ষু, কু, রু, জ্ঞ, পু, ক,—প্রভৃতি অক্ষরের রূপ উল্লেখযোগ্য। লেখার একটী বৈশিষ্ট্যের কথাও এখানে বলা উচিত। এই পুথিতে 'ড' ও 'য'এর নীচে কোন স্থলে বিন্দু ব্যবহৃত হয় নাই। বানান সম্বন্ধে কোনও নিয়ম খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শব্দের আদি য-কার সকল স্থলেই জকার-রূপ ধারণ করিয়াছে। হ্রস্ব ও দীর্ঘ, শ, ষ, স—ইহাদের কোনও পার্থক্য অনুসৃত হয় নাই। প্রবন্ধ-মধ্যে উদ্ধৃত অংশগুলির বানান অনেক স্থলে শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কবিশেখরকৃত কালিকা-মঙ্গলের বিবরণ

গ্রন্থের প্রারম্ভেই 'অবিঘ্ন পরিসমাপ্তি কামনায়' গণেশ, দশাবতার ও অন্যান্য দেবদেবীর বন্দনা। তাহার পর চৈতন্যদেবের বন্দনা ও মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন।

১। *History of Bengali Language and Literature*—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন—পৃঃ ২২৪।

সুহইরাগ।

নবদ্বীপে বন্দো হরি   দ্বিজরূপে অবতারি
চৈতন্য চৈতন্য দিলা নরে।
অনাথ জনেরে ধরি   সঘনে বলায় হরি
পার কৈল এ ভবসাগরে॥
কনক গউর দেহা   কপট সন্ন্যাসী নেহা
নিত্যানন্দ দোসর সন্ন্যাসী।
অনেক ভকত সঙ্গে   ফিরিয়া বুলয়ে রঙ্গে
প্রেমে তনু অভিলাসি॥
ঘন বলে হরি বোল   বাজান কর্ত্তাল খোল
সঘনে নাচএ বাহু তুলি।
কমললোচনে ঘন   প্রেমজল বরিসন
হরিরসে হইয়া আকুলি॥—(পত্র ৩ক)

'চৈতন্যচরণপদ্ম চিত্তেতে করিয়া সদ্ম' কবি কাব্য লিখিতে প্রবৃত্ত হন। অতঃপর দিগ্‌বন্দনা প্রসঙ্গে তিনি পর পর 'কামরূপে কামিক্ষ্যা', 'তিলটকোণায় দেবী সিদ্ধেশ্বরী বিক্রমআদিত্য যথা নিত্য পূজা করি', 'আম্বুয়া মুলুকের ভদ্রকালী,' 'কালীঘাটে ভদ্রকালী', 'বাগ্‌ডাঙ্গায় দেবী রাড়েশ্বরী', 'ভাস্যাডা ধামেতে চামুণ্ডাসুন্দরী,' 'খিবগ্রামে যোগাদ্যা', 'পাড়া আম্বুয়ায় কামারবুড়ি', 'মৌলায় রঙ্কিণী', 'ভাণ্ডারহাটে সাবিত্রী', 'বিক্রমপুরে বিশালাক্ষী', 'রাজবলহাটে রাজবল্লভি', 'জরুড়ের ভগবতী', 'আমতার মেলাই,' 'দাধার চণ্ডিকা', 'বালিয়ায় জয়সিংহবাহিনী', 'ঘুরাণ্যে মাথাল পুরাসের ঘাটু', 'তানপুরে ষষ্ঠী', 'হাসনানের বটু', 'কালীঘাটে দেবী ভদ্রকালী ব্রহ্মা স্থাপিয়া যথা দিলা অঙ্গবলি', 'শ্রীকৃষ্ণনগরে দেবী সিদ্ধেশ্বরী', 'চম্পানগরে দেবী বিষহরী' বন্দনা করেন। এই অপরিহার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য মাঙ্গলিক প্রারম্ভের অবসানে কবি দেবীর আদেশে উপাখ্যান গাহিতে আরম্ভ করিলেন।

'সঙ্গীত রচিতে মাতা কহিলে আপনি।
উরহ আসরমাঝে কঙ্কালমালিনি॥
সপনে কহিলে মোরে দেবি কাত্যায়নী।
স্মরণ করিলে মাত্র আসিবে আপনি।—(পত্র ৪খ)

একদিন নিশীথে এক নৃপতিনন্দন দেবী ভদ্রকালীর যথাবিহিত পূজা করিয়া তাঁহার স্তব করিতেছিল।

কামের নন্দন   হৈয়া একমন
তোমারে করিল স্তুতি।
তোমার চরণ   করিয়া পূজন
তবে ফুল পাইল উসাবতি॥

তোমার চরণ করিল পূজন
অর্জ্জুন একমন হৈয়া।
সেই সে কারণ প্রভু নারায়ণ
সুভদ্রা তারে দিল বিয়া ॥—(পত্র ৫ক)

এই স্তবে নৃমুণ্ডমালিনী দেবী কাত্যায়নীর 'কপালে টঙ্কার পড়িল।' তিনি 'প্রিয়ো দাসী' বিমলার নিকট কে তাঁহাকে স্মরণ করিতেছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল,—

মাণিকানগরে রাজা শ্রীগুণসাগর।
স্মরণ করয়ে তার কুমার সুন্দর॥
বীরসিংহ নৃপতির কন্যা বিদ্যা সতী।
লোকমুখে শুনিলেক বড় রূপবতী॥
বিদ্যারে করিতে বিভা তাহার কারণ।
তেঞি সে সুন্দর করে তোমারে স্মরণ॥ (পত্র ৬ক)

স্থানান্তরে এই মাণিকানগরের অবস্থান 'উৎকল-দ্রাবিড় দেশে' (১৭ক) ও 'দক্ষিণ-দ্রাবিড় দেশে' (২০খ) বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।[১]

বিমলার নিকট সুন্দরের কথা শুনিয়া কালী তৎক্ষণাৎ সুন্দরের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি বর দিতে চাহিলে সুন্দর 'করাঞ্জলি হৈয়া' এইমাত্র প্রার্থনা করিলেন,—

তোমার চরণে এই করি নিবেদন।
নিভৃতে বিদ্যার সনে হৈব দরশন ॥—(৬খ)

কালিকা অমনি প্রার্থনা পূরণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—

স্মরণ করিলে দেখা পাইবে আমার।
লহ মোর নিদর্শন সুয়া করি হাথে।
কথার দোসর পুত্র হব তোর সাথে॥
সর্ব্ব শাস্ত্র জানে সুয়া বিচারে পণ্ডিত।
প্রেমালাপে সুয়া সনে পাবে বড় প্রীত॥
কার্য্য সিদ্ধি হব পুত্র করহ গমন।
থাকিব তোমার সঙ্গে আমি অনুক্ষণ ॥—(৬খ)

তারপর একদিন সুন্দর, মাতা গুণবতী বা পিতা গুণসাগর, কাহাকেও কিছু না বলিয়া পড়ুয়া-বেশে কালীদত্ত শুক পক্ষী লইয়া উত্তরমুখে যাত্রা করিল।

স্বর্ণময় অলঙ্কার যত মনোহর।
বহুমূল্য ধন রাখে খুঙ্গির ভিতর ॥—(৬খ)

১। ভারতচন্দ্রাদিবর্ণিত সুন্দরের দেশ কাঞ্চীর অনতিদূরবর্ত্তী বর্ত্তমান মানিকাপটম্ বা মানিকপত্তনের সহিত এই মানিকানগরের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না, বলিতে পারি না। স্বর্গীয় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উৎকল দেশীয় কাঞ্চী-কাবেরী কথা অবলম্বনে রচিত তাঁহার 'কাঞ্চী-কাবেরী' কাব্যের চতুর্থ সর্গে মাণিকাপত্তন নামের উৎপত্তির এক উপাখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন।

খুরদা এড়ায়্যা গেল শ্বেতরাজার পুর।
চড়ই পর্ব্বত বালা পশ্চাত করিয়া॥—(এক)

সুন্দর চলিতে লাগিল এবং নীলাচলে জগন্নাথ দর্শন করিল। এই প্রসঙ্গে পুরীর দারুমূর্ত্তির উদ্ভবের কারণ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা হরির মূর্ত্তি স্থাপনের জন্য যথাক্রমে স্বর্ণ,তাম্র ও প্রস্তরের পুরী নির্ম্মাণ করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া দেবীর আরাধনা করেন। তাহারই ফলে 'দারুরূপে নীলাচলে অবতারি হৈলা নারায়ণ'। অতঃপর সুন্দর নীলগিরি-শিখরে মরকত-গঠিত মহেশ্বরমূর্ত্তি দেখিয়া শ্বেতগিরি অতিক্রম করিল এবং জঙ্গম পর্ব্বতে উপনীত হইল। সেখানে 'কাঞ্চনে রচিত' ভগবতীর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বনমধ্যে এক সরোবরে সুন্দর মন্দির দেখিতে পাইল। শুক বলিল,—এই সরোবরেই জল লইবার জন্য আসিয়া পাণ্ডবগণ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন এবং অবশেষে যুধিষ্ঠির আসিলে ধর্ম্মের বরে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন। এইরূপ চলিতে চলিতে 'সাত দিন মনুষ্যের সনে দেখা নাঞি।' ক্রমে 'শিব নৃপতির স্থান' অতিক্রম করিয়া বিষ্ণুপুর দিয়া সুন্দর বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইল। বর্দ্ধমানে পৌছিলে সুয়া বিদ্যার বিষয় জানিবার জন্য,—

উধা করি চলি গেলা গগনমণ্ডল।—(১২ক)
দেখিল রাজার রাণী খেলে পাসাসারি।—(১২ক)

অন্তঃপুরে যাইয়া সুয়া বিদ্যাকে দেখিতে পাইল।

দেখিল বিদ্যার রূপে পুরি আলো করে।
সুয়া বলে এত রূপ না দেখি সংসারে॥
চারি দিগে সখিগণ করয়ে বাতাস।
বিরহিণী বিদ্যা ছাড়ে সঘনে নিশ্বাস॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে বৈসে খাটের উপরে।
হাস পরিহাস খেনে সখি সনে করে॥—(১২ক)
বিদ্যা বলে সুয়া তুমি ফির তিন লোকে।
রূপে গুণে বিদ্যায় দেখিলে ভাল কাকে॥—(১৩খ)

এই প্রসঙ্গে সুয়া সুন্দরের অলৌকিক গুণবত্তার কথা বর্ণনা করিলে—

বিদ্যা বলে সেই দেশ হয় কত দূর।
মোর দূত হৈয়া তুমি চল সেই পুর॥
সোনায় বান্ধাব পাখ পায়ের নূপুর।
আমার মনের তাপ যদি কর দূর॥ (১৩খ)

শুক সুন্দরের নিকট বিদ্যার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া বিদায় লইল। সুন্দর নগরাভিমুখে যাত্রা করিল।

কক্ষতলে খুঞ্জি পুথি কান্ধে শোভে দিব্য ছাতি
রতন জড়িত জুতা পায়।
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন সার গলায় রত্নের হার
সামলি গামছা দিয়া গায়॥

পরিল খিরোদ বাস মুখে মৃদু মন্দ হাস

দুই করে রতন-বলয়া।

মানিক অঙ্গুরি পরে অতিশয় শোভা করে

মন্দ মন্দ চলিল মিলয়া ॥—(১৪ক)

জল আনিতে যাইবার সময় এইরূপ বেশে সুশ্রী সুন্দরকে বৃক্ষতলে উপবিষ্ট দেখিয়া বর্দ্ধমানের রমণীকুল মুগ্ধ হইয়া গেল,—

না বহে কাহার কাখে কুম্ভ পড়ে খসি।

না হয় নিমিক কার দেখি মুখশশি ॥—(১৫ক)

নগরের মধ্যে বৃক্ষতলে এক মালিনী ফুল বেচিতেছিল। তাহার সহিত সুন্দরের পরিচয় হইল। তাহারই গৃহে সুন্দরের থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সুন্দর তাহাকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিল।

কথাপ্রসঙ্গে মালিনী বীরসিংহরাজার কন্যা 'পুরুষ-বিদুষী পরমরূপসী শাস্ত্রে যেন সরস্বতী' বিদ্যার পরিচয় প্রদান করিল। এ পর্য্যন্ত বিদ্যার বিবাহ না হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল,—"পাটরাণী কুন্তীর বহু অনুরোধে বীরসিংহ বরের অনুসন্ধানে দেশে দেশে ঘটক পাঠাইয়াছিলেন ; কিন্তু—

যত যত নৃপসুত ঘটকেত আনে।

কোন বর নাহি লয় বিদ্যাবতীর মনে ॥—(১৮খ)

বিদ্যা মাতার নিকট বলিল,—

যেই দিন হরগৌরী মোরে বর দিব।

আপন ইৎসায় বর তবে সে ইচ্ছিব ॥—(১৮খ)

ইহার পর হরগৌরী স্বপ্নে বিদ্যাকে বলিয়াছেন,—দক্ষিণদেশের গুণসাগর রাজার সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পুত্র তাহার বর হইবে। তদনুসারে রাজা গুণসাগরের নিকট এক মাস হইল, মাধব ভাটকে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু দূর দেশ বলিয়া সে এখনও ফিরিতে পারে নাই।"

এই সকল কথা শুনিয়া বিদ্যার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুন্দরের প্রবল আগ্রহ হইল। কিন্তু কি ভাবে তাহার সহিত প্রথম পরিচয় করিবে—কি করিলে বিদ্যা তাহাকে নির্ব্বোধ বলিয়া ভাবিবে না, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে স্থির করিল,—

মালিনী যাইব আজি পুষ্প যোগাইতে।

আপনার নিদর্শন পাঠাইব তাতে ॥

লিখন করিয়া রাখি কুসুমের সনে।

অবশ্য পাইব বিদ্যা পড়িব লিখনে ॥—(১৯খ)

মালিনীকে বাজারে পাঠাইয়া সুন্দর পুষ্প চয়ন করিল এবং বহু যত্নে একগাছি মালা গাঁথিয়া তাহার মধ্যে—

দিব্য তালের পাতে লিখন করিলা তাতে

ভাবিয়া কুমার মনে মনে ॥—(২০খ)

পত্রের মধ্যে নিজের পরিচয়—মাধব ভাটের মানিকানগরে গমন—গুণসাগরের নিকট বিদ্যার বিবাহের প্রস্তাব—গুণসাগরের এখানে আসিয়া বিবাহ দিতে অনভিমত প্রভৃতি কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিল[১]।

এতেক লিখিয়া তবে কুমার সুন্দর।
গুড়াইয়া থুইল পাতি কুসুম ভিতর ॥ –(২১খ)

পত্র পড়িয়া বিদ্যা মালিনীর নিকট সুন্দরের পরিচয় ও সৌন্দর্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিল,—

ভাগিনা তোমার কি বয় তাহার
এ মালা গাঁথিল যেই।–(২৩ক)

তাহার নিকট সুন্দরের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া বিদ্যা মালিনীকে গলার হার পুরস্কার দিলেন এবং তাহার সহিত দেখা করাইয়া দিবার জন্ম অনুরোধ করিলেন।

সরোবরে স্নান আমি করিব যখন।
কেমন ভাগিনা তোর দেখিব তখন ॥—(২৪ক)

পরদিন দুই জনেই স্নানব্যপদেশে সরোবরে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে দুই জনের সাক্ষাৎ হইল। তারপর,—

অন্য ছলে কথা কহে কেহ নাহি লখয়ে
অন্য ছলে অন্য বিবরণ।
অন্য ছলে কহে কথা কুমারী কুমার তথা
দুহাবার সঙ্কেত বচন ॥ –(২৬ক)

কমলে খঞ্জন বসিতে দেখিয়া, বিদ্যা তাহা লক্ষ্য করিয়া সুন্দরকে উদ্দেশ করিয়া একটী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিল এবং ইঙ্গিতে সুন্দরকে তাহার গৃহে আসিতে বলিল। সুন্দর তাহার উত্তররূপে কমলের উপর উপবিষ্টা ভ্রমরীকে সম্বোধন করিয়া অপর একটী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করিল এবং ইহারই মধ্যে ইঙ্গিতে জানাইল যে, সেই দিনই সে বিদ্যার সহিত মিলিত হইবে। উভয়ে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরক্ত হওয়ায় পুনরায় দর্শনের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হইয়া উঠিল। সুন্দর কি উপায়ে বিদ্যার গৃহে যাইবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া ব্যাকুলভাবে কালিকার স্তব করিতে লাগিলেন[২]। কালিকা তাঁহার স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,—

চলহ বিদ্যার ঘরে অভয় দিলাঙ তোরে
হইবেক সুলঙ্গি সরণী।

১। ভারতচন্দ্র এই প্রসঙ্গে সুন্দরকে দিয়া একটী চিত্রকাব্যাত্মক সংস্কৃত শ্লোক লিখাইয়াছেন এবং বিদ্যাকে দিয়া তাহার উত্তরপ্রসঙ্গে আর একটী শ্লোক লিখাইয়াছেন।

২। এই স্তবে এক একটী পয়ারে যথাক্রমে ককারাদি বর্ণের প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে ইহা চৌত্রিশা নামে অভিহিত হয় নাই।

পুরিবেক মনোরথে চলহ সুলজি পথে
যথা বিদ্যা নৃপতি-কুমারী।
মালিনী বিদ্যার ঘরে সুলভ হইব বরে॥—(৩১ক)

এই সুড়ঙ্গপথে সুন্দর বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কিছুক্ষণ পরিহাসের পর বিদ্যা সুন্দরের কবিত্ব ও বিদ্যাবত্তা পরীক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহাকে ময়ূরশিঞ্জন বর্ণন করিতে বলিলে তিনি দুইটী সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়া বিদ্যাকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করিলেন। তখন দুই জনের গান্ধর্ব্ব-বিবাহ সম্পন্ন হইল।

হরিসে কুমারী লাজ পরিহরি
মাল্য দিল তার গলে।
হরিসে কুমার নিজ কণ্ঠহার
বদল করিল রঙ্গে॥
দুঁহে বলে বাণী শুন দিনমণি
আমার গন্ধর্ব্ববেহা।
ধর্ম্মাধর্ম্ম যত তোমা অনুগত
দোস গুণ প্রেমলেহা॥—(৩৩খ)

প্রতি রজনীতে সুন্দর এইরূপে বিদ্যার গৃহে আগমন করিয়া রতিসুখ ভোগ করিতে লাগিলেন।

দিবস হইল রাত্রি রাত্রি হইল দিন।
অনঙ্গ সনঙ্গ রঙ্গে দুজনে প্রবীণ॥—(৩৫ক)

এইরূপে এক বৎসর অতীত হইলে একদিন কালী ও বিমলার মধ্যে নিম্নরূপ কথোপকথন হইল,—

কালিকা বলেন প্রিয়ে বিমলা কিঙ্করি।
উপায় বল না ঝিয়ে কোন্ বুদ্ধি করি॥
কৌতুকে রহিল দাস কুমারী কুমার।
কহনা কেমতে পূজা হইব প্রচার॥
বিমলা বলেন মাতা কঙ্কালমালিনি।
গর্ভবতী হয় যদি রাজার নন্দিনী।
তবে সে কোটাল ধরে নৃপতি সুন্দরে।
বিপত্যে রাখিলে পূজা হইব সংসারে॥—(৩৫খ)

ইহার পর কালিকা পাতাল হইতে এক দৈত্যকে ডাকিয়া বিদ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। এ দিকে কিছু দিন পরে বিদ্যার গর্ভের কথা তাহার সখীদের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িল। বিকটমুখী নামে এক সখী 'ত্রাসে অধমুখী হইয়া' রাণীর নিকট এই গর্ভসংবাদ বলিয়া দিল। বিদ্যা গর্ভের কথা অস্বীকার করিয়া অসুখের অছিলা করিল[১]—

১। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এই অছিলার কথা বর্ণিত হইয়াছে (শ্লোক ৩৫৬ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

জর হৈল পূর্ব্বে তেক্রি দেখ গর্ব্বে
না জানি কেমন ব্যাধি।—(৩৭ ক)

রাণী এই বৃত্তান্ত রাজার কর্ণগোচর করিলে রাজা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কোটালদিগকে তিরস্কার করিলেন; তাহারা দশ দিনের মধ্যে চোর ধরিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু বহু চেষ্টা করিয়াও চোরের সন্ধান পাইল না।

ধরিয়া যোগীর সাজ ভ্রময়ে সহর মাঝ
স্থানে স্থানে প্রতি ঘরে ঘরে।
আর যত সঙ্গিগণ নানা বেশে অনুক্ষণ
ফিরে তারা নগরে নগরে॥
কোটালের যত নারী নাপিতানী বেশ ধরি
ফিবিল লোকের নিকেতনে॥
যতেক নারীব মেলে কথা কহে নানা ছলে
না পাইল চোরের উদ্দিস॥—(৩৯ক-খ)

তখন তাহারা চোর ধরিবাব জন্য এক অভিনব যুক্তি করিল। তাহারা সিন্দুর দিয়া বিদ্যার সমস্ত গৃহ মণ্ডিত করিল[১]। বিদ্যাব গৃহে আসিয়া সুন্দরের বস্ত্রাদি সিন্দুর-রঞ্জিত হইল। রজকের গৃহে সিন্দুররঞ্জিত বস্ত্র দেখিয়া কোটালগণ রজকেব কথামত মালিনীর নিকট আসিয়া সেই বস্ত্রেব অধিকারীব কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু গৃহমধ্যে বহু অনুসন্ধান করিয়াও তাহারা চোর পাইল না—দেখিতে পাইল একটী সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গপথে তাহাদের কয়েকজন বিদ্যাব গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। এ দিকে সুন্দব ইতোমধ্যেই বিদ্যার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল এবং বিদ্যার উপদেশমত নারীবেশ ধারণ করিয়াছিল। তাই কোটালগণ সেখানেও সহসা চোব ধবিতে পারিল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া তাহারা গৃহসম্মুখে একটী গর্ত্ত খনন কবিল[২] এবং উহা পার হইবার জন্য গৃহস্থিত সকলকে অনুরোধ করিয়া বলিল,—

নারীর আছয়ে ধর্ম্ম বাম পদে যায়।
পুরুষের ধর্ম্ম এই ডানি পা বাড়ায়॥
এই ধর্ম্ম যেই জন কবিব লঙ্ঘন।
নবকের কুণ্ডে তার হইব বন্ধন॥—(৪২খ)

একে একে সকল সখী পার হইল। ক্রমে সুন্দরের পালা আসিল। সুন্দর ধর্ম্ম লঙ্ঘন করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া,—

পার হৈতে বাড়াইল দক্ষিণ চরণ॥
হরি শব্দ করি তারে কোটাল ধরিল।
গোপনে আছিল চোর প্রকাশ হইল॥

১। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এই উপায় বর্ণিত হইয়াছে (শ্লোক ৩৬২)।

২। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এইরূপ গর্ত্ত খননের কথা আছে (শ্লোক ৩৮০)।

অঙ্গের ভূষণ যত নিলেক কাড়িয়া।
পিছ মোড়া করি বান্ধে পাটদড়ি দিয়া ॥—(৪৩ক)

কোটালের পায়ে ধরিয়া বিদ্যা প্রাণনাথের প্রাণ ভিক্ষা করিল,—

শুন দুরবারি লহ অলঙ্কার
নাহি মার প্রাণনাথে।
পাপ দুরবার আগেতে আমার
মাথা হান অসিঘাতে ॥
নাহি বান্ধ হাত মোর প্রাণনাথ
কনক কমল জিনি।
জিউক অধিক পিউ প্রাণনাথ
অতসি কুসুমমালি ॥—(৪৩ক)

চোরকে রাজার নিকট উপস্থিত করিলে তিনি তাহার রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তথাপি—

লোকলাজে বীরসিংহ বলে মাব মার।
দক্ষিণ মশানে মাথা হান রে চোরাব ॥—(৪৪খ)

তখন সুন্দর বিদ্যার সহিত তাহার অনুরাগ ও রতিসুখের উল্লেখ করিয়া বিহ্লনকৃত প্রসিদ্ধ চৌরপঞ্চাশৎ কাব্যেব চৌদ্দটী শ্লোক পাঠ করিল।

এই সময় সুন্দরকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য কালী ভীষণ-সাজে সজ্জিত হইলেন। প্রলয়ের আশঙ্কায় দেবগণ শঙ্কিত হইলেন। ইন্দ্র বলিলেন,—

কোন ছার মনুষ্যেরে এতেক সাজনি ॥
মাছির পর্ব্বতঘাত কোথাহ না শুনি।
পতঙ্গে মাতঙ্গে সাজে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥—(৫০খ)

ইন্দ্রের কথামত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে মাধব ভাটরূপে বীরসিংহ রাজার সভায় পাঠান হইল। মাধব সুন্দবের ঐশ্বর্য্য ও মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিল। সুন্দর নিজের পরিচয় এবং বীরসিংহ অপেক্ষা গুণসাগরের মহত্ত্বের আধিক্যের উল্লেখ করিয়া বলিল,—কালিকার আদেশেই সে এইরূপ গোপনে বিদ্যার সহিত মিলিত হইয়াছে। রাজা বিশ্বাস না করিয়া বলিলেন,—

যদি কালী দেখাইতে পার বিদ্যমান।
নিশ্চয় আমার কন্যা দিব তোরে দান ॥
যদি কালী মোরে নাহি দেন দরশন।
দক্ষিণ মশানে তোর বধিব জীবন ॥—(৫২ক)

সুন্দরের ব্যাকুলতায় দেবী বীরসিংহকে দেখা দিয়া সুন্দরের নিকট কন্যা সমর্পণ করিতে আদেশ দিলেন। রাজা যথাশাস্ত্র কালীর সাক্ষাতে কন্যা দান করিয়া,—

ছাগ মেষ গণ্ডক মহিষ দিয়া বলি।
পরিবার সমেত পূজিল ভদ্রকালী ॥
পূজা নিঞা ভদ্রকালী হৈলা অন্তর্ধান।
সুন্দরের রাজা কৈল অনেক সম্মান ॥
পঞ্চ শত ঘোড়া দিল হেমথালা ঝারি।
দুই শত দাসী দিল পরমসুন্দরী ॥—(৫৩ক-খ)

ক্রমে দশ মাস পূর্ণ হইলে বিদ্যা একটী পুত্র প্রসব করিল; তাহার নাম রাখা হইল 'সদানন্দ'। পুথির লিখিত একটী পুষ্পিকা (colophon) অনুসারে এইখানেই কালিকাজাগরণ সমাপ্ত। তবে ইহার পরেও কালিকার পূজাপ্রচারের ও স্বপ্রাধান্যখ্যাপনের চেষ্টার বিবরণ আছে।

পুত্রের অকস্মাৎ নিরুদ্দেশে গুণবতী ও তাঁহার স্বামী গভীর শোকে কালাতিপাত করিতেছিলেন। গুণবতী কালিকার ব্রত আরম্ভ করিলেন। তাহার ফলে কালিকা মাতৃবেশে সুন্দরকে স্বপ্নে দেখা দিলেন। মায়ের কথা মনে পড়ায় সুন্দর দেশে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বিদ্যা বর্দ্ধমানে বার মাসের সুখ বর্ণন করিয়া সুন্দরকে সেই স্থানে আর এক বৎসর থাকিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সুন্দর দেশে যাইতে কৃতনিশ্চয়। বীরসিংহ হর্ষবিষাদ-পূর্ণ মনে লোকজন সঙ্গে দিলেন। সুন্দর গৃহে ফিরিলে সকলেই আনন্দিত হইল।

অন্তঃপুরে বার্ত্তা পায় গুণবতী রাণি।
মৃত শরীরে যেন সঞ্চরে পরাণি ॥—(৫৭খ)

কিছু দিন বেশ সুখেই অতিবাহিত হইল। পূজা না পাইয়া কালিকা ক্রুদ্ধ হইলেন। বিমলা বলিল,—

তৃতীয় কালের শেষে কলি হইল পরবেশে
কলিকালে নর মূঢ়মতি।
তবে পূজে ভদ্রকালী ছাগ মেষ দিয়া বলি
যদি কিছু হয় ত দুর্গতি ॥—(৫৭ক)

কালিকার আদেশে এক রাক্ষসী সদানন্দকে খাইয়া ফেলিল। পুত্রের জীবন-প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে সুন্দর শাস্ত্রানুসারে দেবীর অর্চ্চনা করিল। সুন্দরের অর্চ্চনায় দেবী প্রসন্ন হইয়া সদানন্দকে পুনর্জীবিত করিলেন। তখন গুণসাগর মহাসমারোহে কালিকার পূজা করিলেন। পূজান্তে দেবী গুণবতীর নিকট স্ব-মাহাত্ম্য কীর্ত্তনপ্রসঙ্গে অনাদিকাল হইতে দেবতা ও মানুষকর্ত্তৃক নিজের পূজার কথা বলিলেন। তারপর কালীর সেবক-সেবিকা সুন্দর ও বিদ্যাকে লইয়া রথে স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যমদূত আসিয়া তাঁহাদের পথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইল।

দূত বলে রথে চড়ি পাপী লৈয়া যাহ বুড়ি
মরণ জীবন নাহি মনে।

পাপী জন লৈয়া বথে চল্যাছ বৈকুণ্ঠ-পথে
কোন্ পুণ্য কৈল কোন্ দান ॥—(৬২ক)

ভদ্রকালীর বিক্রমে একে একে যমদূতগণ, স্বয়ং যম, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, নারায়ণ, শিব—সকলেই পরাভূত হইলেন। এইখানে গ্রন্থ খণ্ডিত। বোধ হয়, ইহার পরে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যে দেবীর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তৃত হইবার কথা ছিল।

কবিশেখর-কৃত কালিকা-মঙ্গলের বৈশিষ্ট্য

প্রধানতঃ রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকাব্যের সহিত উপাখ্যানাংশে ইহার ঐক্য থাকিলেও কোন কোন অংশে ইহার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্য করিবার বিষয়। ইহার রচনা-ভঙ্গী বেশ সরল—অনুপ্রাসাদি শব্দালঙ্কারের বাহুল্য বা দীর্ঘ সমাসপ্রাচুর্য্য ইহাকে সাধারণের অবোধ্য করিয়া তুলে নাই। অস্থানে অযথা স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রকাশের ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কবি ইহার রসাভিব্যক্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করেন নাই। নিন্দনীয় গ্রাম্যতাদোষ ইহাকে সাধারণের অপাঠ্য করিয়া তুলে নাই। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকৃত বিদ্যাসুন্দরের রতিসুখভোগের দীর্ঘ ও অশ্লীলতাপূর্ণ বর্ণনা বর্ত্তমানে সাধারণের নিকট তেমন সুরুচিসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। এই মনোহর উপাখ্যান—প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের অতি উপাদেয় ও অন্যতম প্রধান romance—তাই আজ অপেক্ষাকৃত অনাদৃত—অবজ্ঞাত। কিন্তু কবিশেখরের গ্রন্থে এই দোষের লেশমাত্র নাই। বররুচিকৃত সংস্কৃত বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানের এই অংশের বর্ণনা অপেক্ষাও কবিশেখরের বর্ণনা অনেক মার্জ্জিত। কালিকার নিজপূজা প্রচার করিবার প্রবল আগ্রহ ইহাতে অভিব্যক্ত হইয়াছে। ধর্ম্মের এক উদার ভাব এই কাব্যমধ্যে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

উপাখ্যানাংশেও ইহাতে কিছু কিছু নূতনত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। কালিকার বিমলা-নাম্নী কিঙ্করী[১] অথবা কালী কর্ত্তৃক প্রদত্ত শুক পক্ষী দ্বারা সুন্দরের কার্য্যে সাহায্যের উল্লেখ বোধ হয় অন্যত্র নাই। কবিশেখর গুণসাগরকে দক্ষিণ দেশের মাণিকানগরের অধিপতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই নাম বররুচি ও কাশীনাথের রত্নাবতী ও রত্নপুরীর আদর্শে নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়।[২] বররুচি, কাশীনাথ ও কবিশেখরের গুণসাগর, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের হাতে গুণসিন্ধু আকার ধারণ করিয়াছেন। গুণসাগরের স্ত্রীর নাম বররুচি ও কাশীনাথের মতে কলাবতী; রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র ইঁহার কোনও নাম উল্লেখ করেন নাই। কবিশেখর ইঁহার নাম দিয়াছেন—গুণবতী। বীরসিংহের স্ত্রীকে কবিশেখর কুন্তী নামে অভিহিত করিয়াছেন। বররুচি ও কাশীনাথ ইঁহার শীলাবতী, এই নাম দিয়াছেন। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রে ইঁহার কোনও নামের উল্লেখ নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থকারগণের মাধব ভাট ভারতচন্দ্রে গঙ্গাভাট রূপ ধারণ করিয়াছে। কোটালগণ চোর

১। কৃষ্ণরামের গ্রন্থে মালিনীর নাম বিমলা (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃঃ ৫০৪)।

২। গোবিন্দদাসের মতে সুন্দরের বাড়ী কাঞ্চননগর; তবে দক্ষিণদেশে নহে—গৌড়ে। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃঃ ৪৮৯)। কাঞ্চননগরের সহিতও রত্নপুরী ও মাণিকানগরের সাদৃশ্য আছে। এই কাঞ্চননগর হইতেই রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র কাঞ্চী নাম কল্পনা করিয়া থাকিতে পারেন।

ধরিবার জন্য সুন্দরের গৃহ সিন্দুর-বঞ্জিত করিবার কৌশল উদ্ভাবন করিয়াছিল বলিয়া কবিশেখর বর্ণনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র কিন্তু এতদুদ্দেশ্যে তাহাদের স্ত্রীবেশধারণের কথা লিখিয়াছেন। কবিশেখরোক্ত কৌশল বররুচি, কাশীনাথ ও রামপ্রসাদের গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায়। কবিশেখর ও রামপ্রসাদ বিদ্যার সহিত সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎ করাইয়াছেন স্নানব্যপদেশে সরোবরের তীরে। ভারতচন্দ্র বিদ্যার গৃহেই উভয়ের প্রথম সন্দর্শন ঘটাইয়াছেন। এই প্রথম সাক্ষাৎকালে বিদ্যা ও সুন্দরের পরস্পর সঙ্কেত আলাপে উভয়ের মুখে কবিশেখর যে দুইটী সংস্কৃত শ্লোক দিয়াছেন, তাহা রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রে নাই। বররুচিকৃত বিদ্যাসুন্দরের পুথিতেও এই শ্লোক দুইটী পাওয়া গেল না[১]। তবে মোটের উপর, বররুচির গ্রন্থের সহিত কবিশেখরের গ্রন্থের মিল খুব বেশী—স্থানে স্থানে ভাষাগত সাদৃশ্যও দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিশেখরের ভাষা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কবিশেখরের ভাষা অযথা সংস্কৃতভাবাক্রান্ত নহে। সংস্কৃত শব্দ ইহাতে প্রচুর রহিয়াছে সন্দেহ নাই—কিন্তু দীর্ঘ সমাস এবং ভাষায় অল্পপ্রচলিত অভিধান-দৃষ্ট শব্দের প্রয়োগ ইহাকে দুর্বোধ করিয়া তোলে নাই। কেবল এক স্থলে মৈথিল ও পুরাণ বাঙ্গালার মিশ্রণে এক নূতন ভাষা কবি প্রয়োগ করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সেই অংশটী সমস্তই অবিকল এখানে তুলিয়া দিলাম। সুন্দরকে যখন আসামীরূপে কোটালগণ রাজা বীরসিংহের নিকট উপস্থাপিত করিল—ইহা সেই সময়ের বিষয় বর্ণনা করিতেছে।

চোর বিরাজসি মে পুরে কে তোরেন আনিল মোরে
কহ বিচারি।
হাকি হালইযে মুণ্ড কোটয়াল জন্ম নাহি কহ কিয়ে ছরি
ঠাড ভাই কাহে মন ডররার হাকি ঝিকে কেষে দিয়ে দড়ি।
এই ধ্বনি শুনি মুখঠি ভাসত চিতাক পুত্তলী বহ খেড়ি॥
শুনি সুন্দর বোলতশুনেন নররাজ কহে ফিকায় মুড মেরি।
কনক চম্পক রায়ত দেহকান্তি অহো পুত্র তেরি॥
... ... (৪৫ক)

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে সুন্দর মশানে নীত হইলে মাধব ভাট আসিয়া যে ভাষায় কোটালগণকে সুন্দরকে ছাড়িয়া দিতে বলে, তাহার সহিত এই ভাষার কিছু সাদৃশ্য আছে।

পুস্তকের মধ্যে অনেক শব্দের প্রাচীন রূপ ও প্রাচীন বানান দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন উচ্চারণ-সূচক 'ঙ' ও 'ঞ':—ছিলাঙ (২৯ক)—ছিলাম; দিলাঙ—দিলাম (৩১ক),

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় পুথির মধ্যে শ্লোক দুইটী অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে তাঁহার বিদ্যাসুন্দরের পুথি ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। এই সকল কারণে আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

সুঙরিয়া=স্মরিয়া, সুমরিয়া (৭০ক), সুঙরে=স্মরে, সুমরে (১১ক)। তেঞি=তেঁই, সেই হেতু (৬ক). সুনিঞা (৬ক), নাঞি=নাই (১১খ), ঠাঞি=ঠাঁই (১৯খ) [কিন্তু কহি তব ঠাই—.৯খ, এইরূপ প্রয়োগও আছে।]

চ্ছ এই সংযুক্ত বর্ণের স্থলে ত্‌স:—ইৎসা=ইচ্ছা (২৯ক), আৎসা (২৫খ)। বর্ত্তমানেও চলিত ভাষায় 'ত্‌স' স্থানে 'চ্ছ' দৃষ্ট হয়। যথা—মৎস্য=মচ্ছ, চিকিৎসা=চিকিচ্ছে, তিকিচ্ছা।

নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলিও লক্ষ্য করা দরকার। যথা—হকু=হউক (১১খ), জিকু =জিউক (১১খ), আস্য=আইস (১২খ), কর্য=করিও (১২খ)।

ক্রিয়াপদের রূপের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি দ্রষ্টব্য—'অহ' প্রত্যয়ান্ত অনুজ্ঞার ক্রিয়া —যথা—খসাহ=খোল—(৪৩ক)।

অতীত ও ভবিষ্যৎকালের নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি:—হইব=হইবে (৩৫খ), লাগিব =লাগিবে (৩৯খ), হইব=হইবে (৩৭ক), দেখিল=দেখিলাম (৩৭খ), দিল=দিলাম (৪০ক), কহিল=কহিলাম (৪২খ)। ভবিষ্যদর্থে উপরিনির্দ্দিষ্ট প্রয়োগ বর্ত্তমান কালেও পূর্ব্ববঙ্গের কোথাও কোথাও দৃষ্ট হয়।

সর্ব্বনামের মধ্যে—তুয়া=তোমার (৪০ক), তুহ=তুমি (৩৭ক), তুঞি=তুমি (৪৩খ) উল্লেখযোগ্য।

'কে' প্রত্যয়দ্বারা এক স্থলে ষষ্ঠীর অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জিউকে=জীবনের (৪৩ক)। এইরূপ 'য়' প্রত্যয় দ্বারা কর্ম্মপদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে:—চোরায়—চোরকে, চোবাকে (৪৬ক)।

পরিশেষে এই পুস্তকে প্রাপ্ত অধুনা অপ্রচলিত বা অল্পপ্রচলিত কতকগুলি শব্দ ও তাহার রূপের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি আজ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত।

তেঞি—তেঁই (৪৩খ)	পস্রাপ—প্রস্রাব (৩৯ক)
তুঞি—তুমি (৪৩খ)	পীঠিল—পাঠাইল (৩৯খ)
জাকু—যাউক } (৫০খ)	তুয়া—তোমার (৪০ক)
দেকু—দিউক } (৫০খ)	গোড়ায়, গুড়ায়— (৪১ক)
রড়—দৌড় (৬২খ)	পিচমোড়া বান্ধে—হাত পিছনের দিকে দিয়া বান্ধে (৪১ক)
বায়্যায় রা—শব্দ বাহির হয় (৬২খ)	
হকু—হউক (১১খ)	জিউকে—জীবনের (৪০ক)
জিকু—জিউক, জীবিত হউক (১১খ)	পিউ—প্রিয় (৪৩ক)
সান—পাথর (১৪খ)	উলে—নামে (৫২ক)
পসারি—দোকান (১৫খ)	এক সাত—এক সঙ্গে (৫৫ক)
আন্ধার—অন্ধার (১৭ক)	প্রিয়া—প্রিয়
নিন্দ—নিদ্রা (৩৭খ)	উছুর—অধিক (১৯খ) [উছুর হইলে বেলা]

ঝাট—সত্বর
বাসে—ভালবাসে (৩৫খ)
তুহ—তুমি (৩৭ক)
অপছরী—অপ্সরী, অপ্সরা (১৪ক)
সুয়া - শুক (৬খ)
ভাগিনা—বোনপো (২৪ক)
লাগ—খোঁজ, নাগাল (২৯খ)
বালা—বালক (৭ক)
গোড়ায়—কাছে (৪০ক)
[পশ্চাৎ গোড়ায়]
অশ্বমুখ—ঘোড়ার মত উর্দ্ধমুখে, উদ্‌গ্রীব ভাবে (৩৯ক)
মেল—সমূহ (৩৯খ)
ঘটকেত—ঘটকে (১৮খ)

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

গোবিন্দদাস-কবিরাজ*

[১]

কবি-পরিচয়

পদকল্পতরুতে তিন হাজার এক শত একটি পদ আছে। এই পদগুলির মধ্যে কতকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় এবং অপরগুলি মিশ্র মৈথিল-বাঙ্গালা বা ব্রজবুলী ভাষায় বিরচিত। ইহার মধ্যে মিথিলার শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতির রচিত যে পদগুলি আছে সেগুলিও ঠিক মৈথিল ভাষার আকারে নাই—তাহাদের ভাষাও ব্রজবুলীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। পদকল্পতরুর মধ্যে **গোবিন্দ-দাস**-ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলী পদের সংখ্যা চারি শত পঁচিশটী মাত্র। পদামৃতসমুদ্রে গোবিন্দ-দাস'-ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলী পদের মধ্যে ত্রিশটী পদ পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত নাই। ইহা ছাড়া আরও অনেকগুলি পদ আছে, যাহার ভণিতা পদকল্পতরুতে বাদ দিয়া উদ্ধৃত করা হইয়াছে; এইগুলির মধ্যে কতকগুলির ভণিতা পদরসসার প্রভৃতি অপর সংগ্রহ-গ্রন্থে পাওয়া যায়।[১] গোবিন্দদাস-ভণিতা-যুক্ত পদগুলির মধ্যে আবার অন্য কবির ভণিতা-যুক্ত কতকগুলি পদও দৃষ্ট হয়।[২]

গোবিন্দদাস-ভণিতা যুক্ত এই চারি শতাধিক পদ অবশ্য কোন একটী কবির রচনা নহে। বৈষ্ণবসাহিত্যে গোবিন্দদাস নামে বহু কবি ছিলেন। রাধামোহন ঠাকুর স্বীয় পদসংগ্রহগ্রন্থ পদামৃতসমুদ্রের টীকায় কতকগুলি পদের প্রকৃত পদকর্ত্তার নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যত-গুলিই গোবিন্দদাস থাকুক না কেন—**গোবিন্দদাস-কবিরাজ** নামে একজন মাত্র কবি ছিলেন এবং তিনিই যে গোবিন্দদাস-ভণিতা-যুক্ত ব্রজবুলী ভাষায় লিখিত অধিকাংশ এবং শ্রেষ্ঠ পদগুলির রচয়িতা, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই এবং এ যাবৎ ছিলও না। ইনি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন; এবং কৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক বহু বহু সুললিত পদ রচনা করিয়া তৎকালীন বঙ্গীয় কবিগণের শীর্ষস্থান অধিকার করেন। বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ ইঁহার কবিত্বের সমুচিত সমাদর করিয়া ইঁহাকে অনন্যসাধারণ **কবিরাজ** উপাধিতে ভূষিত করেন।

এমন যিনি -

রসনা-রোচন শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

---

* সন ১৩০৬ সাল ১৯এ শ্রাবণ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

১। পদকল্পতরু; পদসংখ্যা ৪২৮, ৯৯৫, ১৩৮২, ১৬১১, ১২৯৬। ইহা ছাড়া গোবিন্দদাসের একটী পদ প্রক্ষিপ্ত আছে (পদকল্পতরু, শ্রীসতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৭)।

২। 'বিদ্যাপতি' + 'গোবিন্দদাস',—ছয়টী; 'রায় বসন্ত' + 'গোবিন্দদাস', তিনটী; 'রায় সন্তোষ + 'গোবিন্দদাস', একটী; রায় চম্পতি' + 'গোবিন্দদাস', দুইটী; 'নরসিংহ রূপনারায়ণ + 'গোবিন্দদাস', একটী; 'রূপ-নারায়ণ' +'গোবিন্দদাস'—একটী। বিদ্যাপতির সহিত গোবিন্দদাসের যুক্ত-ভণিতার পদ আরও দুইটী পাওয়া যায়।

সেই মহাকবি গোবিন্দদাস-কবিরাজ—যাঁহার মাতামহ কবি দামোদর সেন, যাঁহার পিতা চৈতন্যদেবের বিশিষ্ট ভক্ত চিরঞ্জীব সেন, যাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ, যাঁহার গুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য, যাঁহার জন্মস্থান শ্রীখণ্ড—তাঁহাকে এত দিন আমরা ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলিয়াই জানিতাম। সম্প্রতি বাঙ্গালা মাসিক পত্রের আসরে[১] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত বিদ্যাপতি-পদাবলীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এই গোবিন্দদাস-কবিরাজকে মিথিলাদেশবাসী অন্য এক কবি বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার কিছু উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি।

"বৈষ্ণব-কবিতায় যে কয়জন গোবিন্দদাস নামে পদ-রচয়িতা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রধান। ইঁহাকে কবিরাজ অথবা কবীন্দ্র বলিয়া আমরা জানি। কিন্তু তিনি যে বাঙ্গালী নহেন, মিথিলাবাসী, সে কথা অতি অল্প লোকই জানে।

"কবিরাজ বলিতে বৈদ্য বুঝায়, এই ভিত্তির উপর গোবিন্দদাস বৈদ্যজাতীয় অনুমান করিয়া অনেকে ইঁহার বাসস্থান, বংশ প্রভৃতি নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডে গোবিন্দদাস সেন নামক কোন বৈষ্ণব কবি ছিলেন কি না, সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন নাই।" [সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৫, পৃঃ ৭১]

"——এই কবি কবিরাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ। কবিরাজ ইঁহার জাতির পরিচয় সিদ্ধান্ত করিয়া ইঁহার নিবাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নির্ণীত হইয়াছে এবং যে বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম, তাহাও লিখিত হইয়াছে।" [প্রবাসী, ১৩৩৬, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৯৮]।

নগেন্দ্রবাবু শুধু গোবিন্দদাস কবিরাজের মৈথিলত্ব প্রতিপাদন করিয়া সন্তুষ্ট নহেন, তিনি শ্রীখণ্ডবাসী বাঙ্গালী প্রকৃত গোবিন্দদাস কবিরাজের ঐতিহাসিকত্ব উড়াইয়া দিতে চাহেন। শ্রীখণ্ডবাসী প্রকৃত গোবিন্দদাস-কবিরাজের পরিচয় ও তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনা ভক্তি-রত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, প্রেমবিলাস প্রভৃতি প্রামাণিক বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। এবং গোবিন্দদাস-কবিরাজ নিজকৃত সঙ্গীত-মাধব নাটকে নিজের এবং ভ্রাতা রামচন্দ্রের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন[২]। সুতরাং তাঁহার ঐতিহাসিকত্ব এক কথায় উড়াইয়া দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হইবে না।

নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, "এই কবি কবিরাজ গোবিন্দদাস নামে প্রসিদ্ধ। কবিরাজ ইঁহার জাতির পরিচয় সিদ্ধান্ত করিয়া ইঁহার নিবাসস্থান বর্দ্ধমান জেলার শ্রীখণ্ড নির্ণীত হইয়াছে এবং যে বৈদ্যবংশে ইঁহার জন্ম, তাহাও লিখিত হইয়াছে।" বৈষ্ণবসাহিত্যে যাঁহার কিছুমাত্রও জ্ঞান আছে, তিনি জানেন যে, শ্রীখণ্ডবাসী গোবিন্দদাস, অধিকাংশ

১। "কবিরাজ গোবিন্দদাস", বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা (পৃঃ ৭১-৭৬) ; "বৈষ্ণব কবিতার শব্দ ও ভাষা", প্রবাসী ১৩৩৬, জ্যৈষ্ঠ, (পৃঃ ১৯৬-২০৩), আষাঢ় (পৃঃ ৩৪৩-৩৫২)।

২। বধুর্ভাগীরথ্যা(?)ভূমৌ সরজনিনগরে (?) গৌড়ভূপাধিপাত্রাদ্
ব্রহ্মণ্যাদ্ বিষ্ণুভক্তাদপি সুপরিচিতাৎ শ্রীচিরঞ্জীবসেনাৎ।
যঃ শ্রীরামেন্দুনামা সমজনি পরমঃ শ্রীসুনন্দাভিধায়াং
সোঽহং শ্রীমান্নরাখ্যো স হি কবিনৃপতিঃ সম্যগাসীদ্ধতিয়ঃ।—(ভক্তিরত্নাকর, পৃষ্ঠা ১৮,১৯)।

'কবিরাজ' বা 'কবীন্দ্র'র মত স্বয়ংসিদ্ধ উপাধিধারী ছিলেন না। ইঁহার কবিত্বশক্তি ও বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া শ্রীজীব-প্রমুখ বৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণব গোস্বামি-সমাজ ইঁহাকে 'কবিরাজ' উপাধি প্রদান করেন।—

গোবিন্দ শ্রীরামচন্দ্রানুজ ভক্তিময়।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যা কবি সবে প্রশংসয়॥
শ্রীজীব-লোকনাথ-আদি বৃন্দাবনে।
পরমানন্দিত যার গীতামৃত পানে॥
কবিরাজ খ্যাতি সবে দিলেন তথাই।
কত শ্লাঘা কৈল শ্লোকে ব্রজস্থ গোসাঞি॥

—(ভক্তিরত্নাকর, বহরমপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩১)।

(এই স্থানে গোবিন্দদাস কবিরাজের কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া কর্ত্তব্য। গোবিন্দদাস খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রাদুর্ভূত হন[১]। ইঁহার পিতা চিরঞ্জীব সেন শ্রীচৈতন্য-দেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত ছিলেন। ইঁহার আদিম বাসস্থান ছিল ভাগীরথীতীরবর্ত্তী কুমারনগর গ্রাম। ইনি শ্রীখণ্ডবাসী প্রসিদ্ধ কবি ও পণ্ডিত দামোদর সেনের একমাত্র কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডেই বসবাস করেন। তথায় ইঁহার দুইটী পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন—রামচন্দ্র ও গোবিন্দ। জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র অতিশয় সুপুরুষ, সুপণ্ডিত ও সুকবি ছিলেন, এবং উত্তরকালে তিনি রামচন্দ্র কবিরাজ বা শুধু কবিরাজ নামে খ্যাত হন। রামচন্দ্র যখন বিবাহ করিতে যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে গ্রামোপান্তে পুষ্করিণীতীরে আসীন সানুচর শ্রীনিবাস আচার্য্যকে দেখিয়া তাঁহার প্রভাবে মুগ্ধ হন এবং পরদিনই তাঁহার নিকট আসিয়া দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত রামচন্দ্র নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের ইনি অভিন্নাত্মা বন্ধু ছিলেন।[২]

রামচন্দ্র ও গোবিন্দ যখন শিশু, তখনই তাঁহাদের পিতার মৃত্যু হয়। মাতামহের আশ্রয়ে পালিত হইয়া, পরে তাঁহারা পৈতৃক স্থান কুমারনগরে বাস করেন, এবং আরও পরে তেলিয়া বুধরী গ্রামে উঠিয়া যান। মাতামহ শক্তি-উপাসক ছিলেন বলিয়া রামচন্দ্র এবং গোবিন্দও শক্তি-উপাসক হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠের বৈষ্ণবতা দেখিয়া পরে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা লইতে বাসনা করিলেন।[৩] আচার্য্য খেতরী যাইবার পথে বুধরীতে আগমন করেন। তখন গোবিন্দ কঠিন গ্রহণী রোগে ভুগিতেছেন। আচার্য্য তাঁহাকে সুস্থ করাইয়া দীক্ষা প্রদান করিলেন। গোবিন্দের স্ত্রী মহামায়া ও পুত্র দিব্যসিংহও সেই সঙ্গে বৈষ্ণব-দীক্ষা লাভ করেন।[৪])

গোবিন্দের কবিত্বশক্তি দর্শনে শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহাকে কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিতে

১। গোবিন্দদাস সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি খেতরীর মহোৎসবে (১৫৮২-৮৩ খ্রীষ্টাব্দে) উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবতঃ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ করেন।

২। ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ।

৩। ঐ, নবম তরঙ্গ।

৪। ঐ, দশম তরঙ্গ; প্রেমবিলাস, বিংশ বিলাস।

আদেশ করেন। বাসুদেব ঘোষ গৌরলীলা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া গোবিন্দকে গৌরলীলা বর্ণনা করিতে নিষেধ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি তাঁহার কবিতা পাঠে চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ গীত লিখিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিতেন।[১] তাঁহাদের উচ্চ প্রশংসাসূচক এই শ্লোক ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত আছে,—

> শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দনগিরেশ্চঞ্চদ্বসন্তানিলে-
> নানীতঃ কবিতাবলী-পরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্।
> শ্রীমজ্জীবসুবাঙ্ঘ্রিপাশ্রয়জুষো ভৃঙ্গান্ সমুন্মাদয়ন্
> সর্ব্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরম্॥
>
> —(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৩১)।

এইবার নগেন্দ্র বাবুর উত্থাপিত গোবিন্দদাসের মৈথিলত্ব প্রতিপাদক যুক্তিগুলির আলোচনা করিয়া দেখা যাক, সেগুলি কতদূর বিচারসহ।

(১) গোবিন্দদাসের রচিত একটী রামচন্দ্রের বন্দনাপদ আছে (পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২৪০৭)। তাহার ভণিতা এইরূপ,—

> ভকত-আনন্দন মারুত-নন্দন চরণ-কমল করু সেবা।
> গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারণ হরিনারায়ণ দেবা॥

এই পদটী ভক্তিরত্নাকরে কিছু কিছু পাঠান্তর সহিত পাওয়া যায়। তাহার ভণিতাটী এইরূপ,—

> হৃদয়ে আনন্দিত মারুতনন্দন ভরত চরণ করু সেবা।
> গোবিন্দদাস হৃদয়ে অবধারল হরিনারায়ণ অধিদেবা॥
>
> —(ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৩০)

ইহা হইতে নগেন্দ্রবাবু অনুমান করিতেছেন যে, এই হরিনারায়ণ একজন মিথিলার রাজা ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি 'রায় চম্পতি' হইতে অভিন্ন। রায় চম্পতির সহিত গোবিন্দদাসের মিলিত ভণিতার পদ দুইটী পাওয়া যায় (পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৫৩১,৫৩৮)। নগেন্দ্র বাবুর মতে চম্পতি=চম্পারণ্যপতি, অতএব এই হরিনারায়ণ (অথবা অপর এক রাজা নরসিংহ) মিথিলার এবং চম্পারণের রাজা ছিলেন। ইহা বলা বাহুল্য যে, এই নামের কোন মিথিলাধিপ বা চম্পারণপতির সঠিক সন্ধান অদ্যাপিও ইতিহাসে মিলে নাই। (এই হরিনারায়ণ কে ছিলেন ? এই হরিনারায়ণ শিখরভূমির (বর্ত্তমান নাম পঞ্চকোট) রাজা বা জমিদার ছিলেন। ইনি গোবিন্দদাস কবিরাজের বন্ধু ছিলেন, এবং রামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। রাজা শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে চাহেন, কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহাকে নিজে মন্ত্র না দিয়া, ত্রিমল্ল ভট্টের পুত্রকে আনাইয়া তাঁহার দ্বারা রাজাকে

১। "তত্র যদ্যপি স্নেহং বিধায় শ্রীমন্তি গীতানি প্রস্থাপিতানি তেন তু অতীবসঙ্গলসঙ্গতোঽস্মি।" (পত্রিকা ৩)। 'সম্প্রতি যৎ শ্রীকৃষ্ণবর্ণনাময়ধীয়ানি গীতানি প্রস্থাপিতানি পূর্ব্বমপি যানি তৈরমৃতৈরিব তৃপ্তা বর্ত্তামহে, পুনরপি নূতনতত্তদাশয়া মুহুরপ্যতৃপ্তিক লভামহে. তস্মাত্তত্র চ দয়াবধানং কর্ত্তব্যম্।" (গোবিন্দকবিরাজের প্রতি শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র ; পত্রিকা ৪)—[ভক্তিরত্নাকর, চতুর্দ্দশ তরঙ্গ]।

রামমন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করান।[১] এই রামভক্ত রাজার অনুরোধেই গোবিন্দদাস উক্ত রাম-বন্দনাটী রচনা করেন।[২] নগেন্দ্রবাবু বলেন যে, যেহেতু পদকল্পতরুতে অন্য দেবদেবীর বন্দনা নাই, অতএব বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা অন্য দেবদেবীর বন্দনা লিখিতেন না. এবং যেহেতু পদকল্পতরুতে এই একমাত্র রামচন্দ্র-বর্ণনা পাওয়া যায়, অতএব নিশ্চয়ই ইহা কোন মৈথিল কবির রচনা!)

যেমন রাজা হরিনারায়ণের অনুরোধে গোবিন্দদাস রামচরিত্র-গীত লিখিয়াছিলেন, সেইরূপ নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্যপুত্র সন্তোষ দত্ত বা সন্তোষ রায়ের অনুরোধে তিনি সঙ্গীতমাধব নামক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন।[৩] তিনি একটী কবিতায় স্বীয় সুহৃৎ সন্তোষ রায়ের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। সেটী এই,—

নবরুত-মঞ্জু মুকুর-মুখ-মণ্ডল-মুখরিত-মুরলি-সুতান।
শুনি পশু-পাখি-শাখিকুল পুলকিত কালিন্দি বহই উজান॥
কুঞ্জে সুন্দর শ্যামর-চন্দ।
কামিনি-মনহি মুরতিময়-মনসিজ জগ-জন-নয়ন-আনন্দ॥ধ্রু॥
তনু-তনু অনুলেপন ঘন-চন্দন মৃগমদ কুঙ্কুম পঙ্ক।
অলিকুল-চুম্বিত অবনি-বিলম্বিত বনি বনমাল বিটঙ্ক॥
অতি সুকুমার-চরণ-তল শীতল জীতল শরদরবিন্দ।
রায়-সন্তোষ-মধুপ-অনুসন্ধিত নন্দিত দাস-গোবিন্দ॥

—(পদসংখ্যা, ২৪১৫)॥

রাধামোহন ঠাকুরও পদামৃতসমুদ্রে এই পদটীর টীকায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"শ্রীনরোত্তম-ঠক্কুরস্য ভ্রাতা শ্রীসন্তোষরায়নামাসীৎ। তেন শ্রীরাধাকান্তনাম্নঃ শ্রীমূর্ত্তেরেতদ্রূপদর্শনং কৃত্বা শ্রীগোবিন্দকবিরাজঠক্কুরায় তদ্বর্ণায়িতুং প্রার্থনা কৃতা। অতস্তন্নাম দত্তম্।"

(২) গোবিন্দদাস-কবিরাজের অপর দুইটী পদে এইরূপ ভণিতা পাওয়া যায়,—

কমলা-লালিত-চরণ-কমল-মধু পাওয়ে সোই সুজান।
রাজা নরসিংহ রূপনারায়ণ গোবিন্দদাস অনুমান॥

—(পদসংখ্যা ২৪১৬)।

এবং—গোবিন্দদাস ভণ রসিক-রসায়ন।
রসয়তু[৪] ভূপতি রূপনারায়ণ॥—(পদসংখ্যা ২৪২০)।

১। শিখরভূমির রাজা হরিনারায়ণ।—ইত্যাদি (ভক্তিরত্নাকর, পৃঃ ৫৮৩)।

২। হরিনারায়ণ রাজা বৈষ্ণবপ্রধান। রামচন্দ্র বিনা তিঁহ না জানয়ে আন॥
তিঁহ যৈছে শিষ্য হইলা যে শিষ্য করিল। সে সব প্রসঙ্গ এথা বর্ণিতে নারিল॥
হরিনারায়ণ কবিরাজে নিবেদিলা। শ্রীরামচরিত্র গীত তারে বর্ণি দিলা॥—(ঐ, পৃঃ ৬২)।

৩। ঐছে শ্রীসন্তোষ দত্ত অনুমতি দিল। সঙ্গীতমাধব নাম নাটক বর্ণিল॥
রাধাকৃষ্ণ পূর্ব্বরাগ অপূর্ব্ব তাহাতে। শুনিয়া সন্তোষদত্ত পরমানন্দ চিতে॥—(ঐ, ৬২)।
এবং—গোবিন্দ-কবিরাজ শ্রীসন্তোষ রায়ের রীতি। গীতে ব্যক্ত করিলেন মনে পাঞা প্রীতি॥
—(প্রেমবিলাস, ২০ বিলাস)।

৪। 'রসময়' নগেন্দ্রবাবুর অশুদ্ধ পাঠ।

কেবল এই ভণিতা দুটী এবং স্বীয় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া নগেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, —'নরসিংহ-রূপনারায়ণ মিথিলার রাজা' (সা-প-প, পৃঃ ৭৩)। প্রকৃত পক্ষে এই দুই ভণিতায় 'নরসিংহ, রূপনারায়ণ' এবং 'ভূপতি, রূপনারায়ণ' দুই জনকে বুঝাইতেছে। প্রেমবিলাস (২০ বিলাস) হইতে জানা যায় যে, রাজা নরসিংহ ও তাঁহার সভাপণ্ডিত কবি ও সুগায়ক রূপনারায়ণ নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য হইয়াছিলেন। রূপনারায়ণ বৃন্দাবনে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁহারই আদেশে নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। 'পক্কপল্লীর' রাজা নরসিংহ ও তাঁহার সভাসদ্ পণ্ডিত রূপনারায়ণ (ইনিই কি পদকর্ত্তা রূপনারায়ণ ?) গোবিন্দদাসের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, সেই জন্যই গোবিন্দদাস এই দুই জনের প্রতি প্রীতি জানাইবার জন্য ভণিতার মধ্যে ইহাঁদের নাম গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপে কবি তাঁহার বন্ধু পদকর্ত্তা রায় বসন্ত বা বসন্ত রায়—যিনি নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন[১]—তাঁহার নামও কতিপয় পদের ভণিতায় গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন।[২]

নগেন্দ্র বাবু শুধু 'রূপনারায়ণ', 'নরসিংহ' ও 'রূপনারায়ণ' ভণিতাযুক্ত পদ তিনটী লইয়াই সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন, স্পষ্টতঃ বাঙ্গালী নাম বলিয়া 'রায় সন্তোষ' এবং 'রায় বসন্ত' ভণিতাযুক্ত পদ চারিটীর[৩] উল্লেখ বা আলোচনা করেন নাই। অথচ এই পদগুলি সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে কোন ক্রমেই যে গোবিন্দদাস-কবিরাজের লেখনীর অযোগ্য, তাহা কিছুতেই বলা চলে না।

(৩) নগেন্দ্রবাবু বলেন, "কিন্তু কবীন্দ্র গোবিন্দদাসের ভাষা এমন মার্জ্জিত, তাঁহার শব্দের ঐশ্বর্য্য এত বিপুল যে, বাঙ্গালীর পক্ষে সেরূপ ভাষা প্রয়োগ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" (সা-প-প, পৃঃ ৭৪)।

যদিও এই যুক্তি অত্যন্ত অসার ও মূল্যহীন, তথাপি আমি এই স্থানে যথেচ্ছ কতকগুলি পদ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, গোবিন্দদাসের সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী অনেক কবি গোবিন্দদাসের মতই মার্জ্জিত ও সুললিত ভাষায় পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। পদকল্পতরু হইতে যদৃচ্ছা কয়েকটী উদাহরণ তুলিয়া দিতেছি।

বিকচ-সরোজ-ভান-মুখ-মণ্ডল দিঠি-ভঙ্গিম নট-খঞ্জন জোর।
কিয়ে মৃদু-মাধুরি-হাস উগারই পী পী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর॥
বরণি না হয় রূপ বরণ চিকনিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ কিয়ে কুবলয়দল কিয়ে কাজর কিয়ে ইন্দ্রনিলমণিয়া॥

১। শ্রীনরোত্তমের শিষ্য নাম শ্রীবসন্ত। বিপ্রকুলোদ্ভব মহাকবি বিদ্যাবন্ত॥—(ভক্তিরত্নাকর, পৃষ্ঠা, ২৮)॥

২। প্রেমবিলাস (২০ বিলাস) দ্রষ্টব্য।

৩। গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজ রায়-বসন্ত॥ (পদসংখ্যা ১০৫০)॥
তো বিনু কিসলয়-শয়ন বীজন বিফল ভেল মতিমন্ত।
দাস-গোবিন্দ এ রস গাহক ভাওয়ে রায়-বসন্ত॥ (পদসংখ্যা ১১২০)॥
কামিনি-কর-কিসলয়-বলয়াঞ্চিত-রাতুল-পদ-অরবিন্দ।
রায়-বসন্ত-মধুপ-অনুসঞ্চিত নন্দিত দাস-গোবিন্দ॥—(পদসংখ্যা ২০২২)॥

অঙ্গদ বলয় হার মণি-কুণ্ডল চরণে নূপুর কটি-কিঙ্কিণি-কলনা।
অভরণ-বরণ-কিরণে অঙ্গ ঢর ঢর কালিন্দি জলে যৈছে চান্দকি চলনা॥
কুঞ্চিতকেশ বেশ কুসুমাবলি শিব পর শোভে শিখি-চান্দকি ছান্দে।
অনন্তদাস-পহু অপরূপ-লাবণি সকল-যুবতিমন পড়ি গেও ফান্দে॥
—(পদসংখ্যা ২৬৮)॥

কাঞ্চন-রুচিহর বয়নি বিশালা। তছু পর অভিসার কর ব্রজবালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর। নিশবদ-পথ-গতি চললিহ থোর॥

* * * * *

যতনহি নিঃসক নগর ভুবন্তা। শেখর আভরণ ভেল বহন্তা।(পদসংখ্যা ২৭০৬)
কৈছে চরণে করপল্লব ঠেললি মীললি মানভুজঙ্গে।
কবলে কবলে জিউ জরি যব যায়ব তবহি দেখব ইহ রঙ্গে॥

* * * * *

অবিরোধি-প্রেমপন্থ তুহুঁ রোধলি দোষলেশ নাহি নাহ।
বৃন্দাবন কহ নিষেধ না মানলি হামারি ওরে নাহি চাহ॥ (পদসংখ্যা ৪৬৮)।

জয় নাগর-বর-মানস-হংসী। অখিল-রমণি-হৃদি-মদ-বিধ্বংসী॥
জয় জয় জয় বৃষভানু-কুমারী। মদন-মোহন-মন-পঞ্জর-শারী॥
জয় যুবরাজ-হৃদয়-বন-হরিণী। শ্রীরন্দাবন-কুঞ্জর-করিণী॥
কুঞ্জ-ভুবন-সিংহাসন-রাণী। রচয়তি মাধব কাতরবাণী॥ (পদসংখ্যা ২৬৬৫)॥

লহু লহু মুচকি হাসি চলি আওলি পুন পুন হেরসি ফেরি।
জনু রতিপতি সঞে মিলন রঙ্গভূমে ঐছন কয়ল পুছেরি।

* * * * *

হাম সব নিজজন কহসি রাত্তি দিন সো সব বুঝনু আজ কাজে।
জ্ঞানদাস কহ সখি তুহুঁ বিরমহ রাই পায়ল বহু লাজে॥ (পদসংখ্যা ২৩০)।

প্রবন্ধের কলেবর অযথা বাড়িয়া যায় বলিয়া আর অধিক উদাহরণ উদ্ধৃত হইল না। গোবিন্দদাস মহাকবি, তাঁহার মত অতগুলি ভাল ভাল পদ সকল বৈষ্ণব পদকর্ত্তা রচনা করিতে পারেন নাই—এ কথা ঠিক। সকলে সমান কবিত্বশক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন না। কিন্তু তাই বলিয়াই যে গোবিন্দদাস বাঙ্গালী হইতে পারেন না—এই যুক্তি অতীব তুচ্ছ। গোবিন্দদাসের লেখা যেমন বেশী রকম মৈথিলঘেঁষা দেখা যায়, তেমনি শিবরাম, নরহরিদাস (ঘনশ্যাম), জ্ঞানদাস ও রাধামোহন ঠাকুরের রচনার মধ্যেও তাহাই দেখা যায়। তবে গোবিন্দদাসের মত অন্যান্য পদকর্ত্তারা বিদ্যাপতিকে বিশেষরূপে অনুকরণ করেন নাই; তাঁহারা ব্রজবুলী অপেক্ষা খাস বাঙ্গালাতেই বেশী পদ রচনা করিয়াছেন। সেই কারণ তাঁহাদের রচিত ব্রজবুলী পদের মধ্যে ভাষার বাঙ্গালা রীতি কিছু অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়

(৪) নগেন্দ্র বাবুর মতে গোবিন্দদাসের ভণিতাযুক্ত কোন ভাল গৌরচন্দ্রিকার পদ পাওয়া যায় না ; ইহার কারণ, তাঁহার মতে, "মিথিলার কবি কৃষ্ণ ও রাধাবিষয়ক পদ রচনা করেন, চৈতন্যদেবের বিষয়ে একটীও পদ রচনা করেন নাই।" (সা-প-প, পৃঃ ৭৪)।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণবসমাজ গোবিন্দদাসকে গৌরাঙ্গলীলা সম্বন্ধে পদ রচনা করিতে নিষেধ করিয়া, কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করেন। ইহার কারণ, গোবিন্দদাসের অনেক পূর্ব্বেই চৈতন্যদেবের ভক্ত ও অনুচর বাসুদেব ঘোষ মহাশয় গৌরলীলা বর্ণনা করিয়া উত্তম উত্তম পদ প্রচুর লিখিয়াছেন।[১] এই হেতু গোবিন্দদাস-কবিরাজের রচিত গৌরলীলাবর্ণনার বিশেষ কোন পদ পাওয়া যায় না। তবে গোবিন্দদাস-কবিরাজ-রচিত উৎকৃষ্ট গৌরবন্দনা বা গৌরচন্দ্রিকার পদ যথেষ্ট পাওয়া যায়। এখানে কয়েকটী উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

দেখত রেকত গৌরচন্দ্র, বেড়ল ভকত-নখতরন্দ,
অখিল-ভুবন-উজরকারি, কুন্দ-কনক-কাঁতিয়া।
অগতি পতিত কুমুদবন্ধু, হেরি উছল রসক সিন্ধু,
হৃদয়-কুহর-তিমিরহারি, উদিত দিনহিঁ রাতিয়া ॥
ইত্যাদি (পদসংখ্যা .০৬৩)।

দেখ দেখ নাগর গৌর-সুধাকর জগত-আহ্লাদন-কারী।
নদীয়া-পুররর-রমণী-মণ্ডল-মণ্ডন-গুণমণি-ধারী। ইত্যাদি (পদসংখ্যা ২১৩৫

নিরুপম-হেম-জ্যোতি জিনি বরণা।
সঙ্গিত-রঙ্গি তরঙ্গিত-চরণা॥ ইত্যাদি (পদসংখ্যা ২০৭৫)।

শ্রীপদকমল-সুধারস-পানে। শ্রীবিগ্রহগুণগণ করি গানে॥ ইত্যাদি পদসংখ্যা ২৭)

যামিনি জাগি জাগি জগ-জীবন জপতহি যদুপতি-নাম।
যাম যামযুগ যৈছন জানত জব জব জীবন মান॥ ইত্যাদি (পদসংখ্যা ১৮৮৭)।

চম্পক-সোন-কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু-লাবণি রে।
উন্মত গীম সীম নাহি অনুভব জগমনমোহন ভাঙনী রে[২] ॥ ইত্যাদি (পদসংখ্যা ৩)।

ভাষা ও ভাবের দিক্ দিয়া এই কবিতাগুলি গোবিন্দদাস-ভণিতাযুক্ত শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির অন্যতম।

(৫) নগেন্দ্র বাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন,—"যে সকল পদের ভণিতায় বিদ্যাপতি ও গোবিন্দ-

---

১। গৌরপ্রিয় বাসুদেব ঘোষ মহাশয়। নির্য্যাস বর্ণন কৈল যত গুণচয়।
বাহুল্য বর্ণিব কর রাধাকৃষ্ণলীলা। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি যে ভাবে লিখিলা॥—(প্রেমবিলাস, ২০ বিলাস)।

২। নগেন্দ্র বাবু এই চমৎকার কবিতাটীকে গোবিন্দদাস-কবিরাজের রচিত বলিয়া মনে করেন না (প্রবাসী, ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ২০০), কিন্তু কোন উপযুক্ত কারণ দেখান নাই।

দাস উভয়ের নাম আছে, সেখানে বুঝিতে হইবে যে, এই গোবিন্দদাস মিথিলার কবি।" (প্রবাসী, ১৩৩৩, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ২০২)।

অদ্ভুত সিদ্ধান্ত বটে! গোবিন্দদাসের সহিত রায় বসন্ত, রায় সন্তোষ ইত্যাদি বাঙ্গালী কবি ও রসজ্ঞের নাম পাওয়া যায়। তখন কি করিয়া এই সিদ্ধান্ত আসিতে পারে? সত্য বটে যে, বিদ্যাপতির কবিতার সহিত গোবিন্দদাসের কবিতার ঘনিষ্ঠ সংস্রব আছে। ইহার কারণ, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির পদাবলী আদর্শ-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা গোবিন্দদাসের রচিত অন্যতম বিদ্যাপতি-বন্দনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সেই পদটী এই,—

বিদ্যাপতি-পদ-যুগল-সরোরুহ-নিস্যন্দিত-মকরন্দে।
তছু মঝু মানস-মাতল-মধুকর পিবইতে করু অনুবন্ধে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক-শিরোমণি-নাগর-নাগরী-লীলা স্ফুরব কি মোয়॥ধ্রু॥
জনু বাঙন করে ধরব সুধাকর পঙ্গু চড়ব কিয়ে শিখরে।
অন্ধ ধাই কিয়ে দশ দিশ খোজব মিলব কল্পতরু-নিকরে॥
সো নহ অন্ধ করত অনুবন্ধহি ভকতনখর-মণি-ইন্দু।
কিরণ-ঘটায় উদিত ভেল দশ দিশ হাম কি না পায়ব বিন্দু॥
সোই বিন্দু হাম যৈখনে পায়ব তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস অতয়ে অবধারল ভকত-কৃপা বলবান॥—(পদসংখ্যা ১২)।

এই পদের—বিশেষতঃ ধ্রুবপদটীর ভাব শ্রীচৈতন্যদেব-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের কোন কবি ভিন্ন অন্য কাহারও লেখা একেবারেই অসম্ভব। কবি গোবিন্দদাস গুরু-সমাজ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া বিদ্যাপতির অনুসরণে[১] কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিবেন। তাই কবি পূর্ব্ববর্ত্তী সুপ্রসিদ্ধ কবির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, যেন রাধাকৃষ্ণের লীলা তাঁহার নিকট স্ফূর্ত্ত হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, গোবিন্দদাস-কবিরাজের আটটী কবিতায় 'বিদ্যাপতি' ভণিতা দৃষ্ট হয়। যথা,—

বিদ্যাপতি কহে মিছ নহ ভাখি।
গোবিন্দদাস কহ তুহুঁ তাহে সাখি॥—(পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৯৩)।

এত কহি বিষাদ ভাবি রহুঁ মাধব রাই-প্রেমে ভেল ভোর।
ভণয়ে বিদ্যাপতি গোবিন্দদাস তথি পূরল ইহ রস ওর॥

—(ঐ, পদসংখ্যা ২৬১)।

[এই পদের ভাষাও তো মিশ্র বাঙ্গালা ও মৈথিল; তাহা হইলে নগেন্দ্র বাবুর সিদ্ধান্ত খাটে কি করিয়া?]

১। গোবিন্দদাস নিজকৃত অপর বিদ্যাপতি-বন্দনায় বলিতেছেন,—

গোবিন্দদাস মতিমন্দে।
এত রূপ-সম্পদ রহইতে আমমন বৈছন বামন ধরবহি চন্দে।

—(পদসংখ্যা ২৩৩৬)।

বিদ্যাপতি কহে ঐছন কান।
দাস গোবিন্দ ও রস ভাণ ॥—(প-ক-ত, পদসংখ্যা ৪০০)।
বিদ্যাপতি কবি ভাষ।
কহতহি হেরত গোবিন্দদাস ॥—(ঐ, পদসংখ্যা ১২৯৬)[১]।

পাপ পরাণ আন নাহি জানত কানু কানু করি ঝুর।
বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব গোবিন্দদাস রস-পূর ॥—(ঐ, পদসংখ্যা ১৬৪০)।

বিদ্যাপতি কহ কৈছন প্রীত। গোবিন্দদাস কহ ঐছন রীত ॥
—(ঐ, পদসংখ্যা ১৬৭১)।

বিদ্যাপতি-পদ মোহে উপদেশল রাধা-রসময়-কন্দা।
গোবিন্দদাস কহ কৈছন হেরব সো হেরি লাগযে ধন্দা ॥
—(পদামৃতসমুদ্র, বহরমপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৯৭)।

তাকর অন্তর অলই নিরন্তর বিদ্যাপতি ভালে জান।
কিঞ্চিত কাল কলপ করি মানই গোবিন্দদাস পরমাণ ॥
—(ঐ, পৃষ্ঠা ১০৯)।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই ভণিতাগুলির সর্ব্বত্রই বিদ্যাপতির নাম অগ্রে এবং গোবিন্দদাসের নাম পরে দেওয়া আছে।

এই যুক্ত-ভণিতা দেওয়ার কারণ কি? বিদ্যাপতি গোবিন্দদাসের তো সমসাময়িক বা বন্ধু ছিলেন না, যে বন্ধুত্বের খাতিরে গোবিন্দদাস এইরূপ করিয়াছেন। ইহার কারণ দুইটী হইতে পারে। এক—বিদ্যাপতিকে সম্মান জ্ঞাপন করিবার জন্য গোবিন্দদাস স্বীয় ভণিতায় তাঁহার নাম লইয়াছেন। অথবা, ইহা খুবই সম্ভব যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত বিদ্যাপতির কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদকে গোবিন্দদাস সম্পূর্ণ বা সংস্কৃত করিয়া গিয়াছেন এবং কবিতাগুলির রচনার কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আত্মসাৎ না করিয়া যুক্ত-ভণিতা দিয়া গিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুরও একটী পদের [প-ক-ত ৯৩] ব্যাখ্যায় লিখিয়া গিয়াছেন,—"পক্ষে বিদ্যাপতিঠক্কুরস্য গীতপূরণং গোবিন্দদাসকবিরাজ-কৃতমিতি গম্যতে।" এবং পদামৃতসমুদ্রের (পৃঃ ৯৭) উল্লিখিত প্রথম কবিতাটীর টীকায়ও লিখিয়াছেন,—"পক্ষে, বিদ্যাপতিকৃতত্রিচরণগীতং লব্ধ্বা শ্রীগোবিন্দকবিরাজেন চরণৈকং কৃত্বা পূর্ণং কৃতম্।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, নগেন্দ্রবাবুর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক।

নগেন্দ্রবাবুর প্রদত্ত যুক্তিগুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখা গেল যে, গোবিন্দদাস-কবিরাজকে কোন ক্রমেই মৈথিল প্রতিপন্ন করা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-মহাশয় শুধু গোবিন্দদাস-কবিরাজকে গোবিন্দদাস ঝা বানাইয়াই সন্তুষ্ট নহেন, তিনি শ্রীখণ্ডবাসী প্রসিদ্ধ গোবিন্দদাস-কবিরাজকে উড়াইয়া দিতে চাহেন। আমাদের দেশে এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন সকল কবিকেই আলোচনাকারীর ইচ্ছামত স্বদেশ বা স্বগ্রামবাসী, এমন কি, স্বজাতীয় প্রতিপন্ন করিবার এক প্রচণ্ড চেষ্টা হইয়াছিল। এখন

১। পদকল্পতরুতে এই পদটী ভণিতাহীন দৃষ্ট হয়।

দেখিতেছি যে, বিদেশবাসী প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইতেছে। যুক্তিহীন অথবা সত্যহীন হইলে উভয় চেষ্টাই তুল্যরূপে গর্হিত।[১]

এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করি। এই প্রবন্ধমধ্যে আমি যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত পদকল্পতরুতে যেরূপ ভাবে মুদ্রিত আছে, প্রায় সেইরূপই রাখিয়াছি। 'ঐসন'কে 'অইসন', 'আয়ল'কে 'আএল' করিয়া 'মৈথিল' রূপান্তর দিতে চেষ্টা করি নাই।

বঙ্গ-সাহিত্যে আর যাহা কিছুর অভাব থাকুক না কেন, সৎকবির অসদ্ভাব কোন কালেই ছিল না। বাঙ্গালা সাহিত্যে কাব্যের আদর চিরকালই আছে বটে; কিন্তু কবিদের জীবন-চরিত ও জীবন-কাল সম্বন্ধে বাঙ্গালী চিরকালই অতিমাত্রায় উদাসীন। আধুনিক-পূর্ব্ব বঙ্গ-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস। তাঁহার আবির্ভাবকাল ও জীবনের ঘটনা সম্বন্ধে আমরা কি জানি? শুধু কতকগুলি গল্প মাত্র, এবং তাঁহার আবির্ভাব সময় লইয়া আলোচনাকারীর রুচি, ইচ্ছা এবং সুবিধামত পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত টানা-হিঁচড়া চলিতেছিল। শুধু শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ-মহাশয় কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন আবিষ্কৃত হওয়াতে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌দিগের সাহায্যে একটা মোটামুটি সময়ের ধারণা হইয়াছে মাত্র। বিদ্যাপতি সম্বন্ধে আমাদের অনেক ভুল ধারণা ছিল ও আছে। সে সকলের এ যাবৎ কোন মীমাংসা হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-মহাশয় তাঁহার সম্পাদিত বিদ্যাপতির কীর্ত্তিলতার ভূমিকায় বিদ্যাপতি সম্বন্ধে অনেক নূতন ও মূল্যবান্ তথ্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত Journal of the Department of Artsএ বিদ্যাপতির সময় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটী খুব মূল্যবান্ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। নগেন্দ্রবাবু কবিশেখর, কবিরঞ্জন, রায় চম্পতি, সিংহভূপতি প্রভৃতি সম্ভব-অসম্ভব ভণিতার পদ যথেচ্ছ বিদ্যাপতির বলিয়া চালাইয়া দিতে চাহেন। "ভাবিয়া দেখিয়া গণিয়া দেখিলে" বিদ্যাপতির পদের সংখ্যা এক শতটীর উর্দ্ধে যাইবে কি না—ঘোরতর সন্দেহ। কৃত্তিবাস অত বড় কবি, তাঁহার উল্লিখিত "পঞ্চ গৌড়েশ্বর" লইয়া দ্বন্দ্ব এখনও তুমুল চলিতেছে। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম লইয়া আলোচনার সম্বল তো কেবল "ডিহিদার মামুদ সরিপ" ও "ধন্য রাজা মানসিংহ"! পদ্মাপুরাণ-রচয়িতা বিজয়-গুপ্তের বর্ত্তমান বংশধর তাঁহা হইতে পাঁচ পুরুষ মাত্র· তাহা হইলে তো বিজয়গুপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের লোক হইয়া দাঁড়ান! দূরের কথা যাউক, সে দিনকার ভারতচন্দ্র বা রামপ্রসাদ সম্বন্ধেই বা আমরা কতটুকু জানি? ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে প্রচলিত গল্পগুলি তো ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-মহাশয় লিখিয়া গিয়াছিলেন, আমরা সেই কবি-কাহিনী সকলের পুনরুক্তি করিতেছি মাত্র।

১। গোবিন্দদাসের বিবাহ ছাড়া আরও অনেক নূতন নূতন অশ্রুতপূর্ব্ব 'তথ্য'র পরিচয় নগেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধে পাওয়া যায়। অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া তাহার আলোচনা এখানে করা গেল না। [পাছে কেহ কিছু মনে করেন, এই ভাবিয়া এখানে উল্লেখ করা উপযুক্ত মনে করি যে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের লেখক কায়স্থজাতীয়—বৈদ্য-জাতীয় নহেন]।

এই তো অবস্থা। ইহার মধ্যে গোবিন্দদাস-কবিরাজ হইতেছেন একমাত্র বড় কবি, যাঁহার সম্বন্ধে স্পষ্ট, বিস্তৃত ও সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। ইঁহার পিতৃকুল, মাতৃকুল, গুরুকুল, বন্ধু-সমাজ—কেহই অজ্ঞাত, অখ্যাত নহেন। শুধু তাহাই নহে। বঙ্গ-সাহিত্যে যাহা অনন্যদুর্লভ, তাহা অর্থাৎ গোবিন্দদাস-কবিরাজের কাব্যরচনার একটা প্রামাণিক ও ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। ইতিহাস-প্রবঞ্চিত বঙ্গদেশ ও বঙ্গ-সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু এই সৌভাগ্যই বা আমাদের সহিবে কেমন করিয়া? সম্পূর্ণ পরিচয়যুক্ত এই একমাত্র কবির বঙ্গদেশে কোন অস্তিত্ব ছিল না বলিয়া আমরা খেয়াল দেখিতেছি। ইতিহাস-সরস্বতীর অপূর্ব্ব বিদ্রূপ।

(গোবিন্দদাস-কবিরাজ তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ মৈথিল-ভাষায় লিখেন নাই। তিনি যে ভাষায় লিখিয়াছেন, তাহা একটী মিশ্র ভাষা। এই ভাষা বিদ্যাপতি সমসাময়িক প্রাচীন মৈথিল ভাষা হইতে উদ্ভূত এবং বাঙ্গালা ভাষার রস-সঞ্চারে পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত। বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালী কবির লেখনীতে এই ভাষার জন্ম। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-বিলাস এবং শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা-প্রসঙ্গই এই ভাষার উপজীব্য বস্তু বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার এই সাহিত্যিক পরগাছা বা উপভাষা "ব্রজবুলী" নামেই প্রসিদ্ধ।) কিন্তু এই পরগাছা এখন ভাষা-তরুর অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। প্রায় চারি শত বৎসর পূর্ব্বে এই মিশ্র ভাষার উদ্ভব হয়, এবং আধুনিক যুগ পর্য্যন্ত এই ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি চলিয়া আসিতেছে। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ রায়, রবীন্দ্রনাথ, সুরেশচন্দ্র ঘটক, কালিদাস রায় প্রমুখ কবিরা বিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ব্রজবুলী সাহিত্যের ইতিহাস টানিয়া আনিয়াছেন। গোবিন্দদাস-কবিরাজ এই বিস্তৃত কাব্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। বিদগ্ধসমাজে তাঁহার কবিত্বের যথোচিত আলোচনা ও সমাদর তো হয়ই নাই, উপরন্তু নানাবিধ ভ্রমাত্মক তথ্য প্রচারিত হইতেছে, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়।

[২]

কবি-উল্লিখিত ব্যক্তি-পরিচয়

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, গোবিন্দদাস-কবিরাজের কতকগুলি পদের ভণিতার মধ্যে অপর ব্যক্তি বা কবির নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পদকল্পতরুধৃত পদগুলির মধ্যে ছয়টী পদে বিদ্যাপতির ভণিতা[১], তিনটী পদে রায়-বসন্তের ভণিতা[২], একটী পদে রায়-সন্তোষের ভণিতা[৩], একটী পদে হরিনারায়ণের ভণিতা[৪], একটী পদে নরসিংহ রূপনারায়ণের ভণিতা[৫], একটী পদে ভূপতি রূপনারায়ণের ভণিতা[৬] ও দুইটী পদে রায়-চম্পতির ভণিতা[৭] দেখিতে পাওয়া যায়।

১। পদসংখ্যা [৯৩, ২৬১, ৪০০, ১২৯৬, ১৬৪০; ১৬৭১,] ; পদামৃতসমুদ্রে দুইটী অতিরিক্ত এইরূপ ভণিতার ~~পদ পাওয়া যায় (পৃষ্ঠা ৯৭, ১০৯ ; বহরমপুরের দ্বিতীয় সংস্করণ~~)।

২। পদসংখ্যা [১০৫০, ১৭২০, ২৪২২]।

৩। পদসংখ্যা [২৪১৫]। ৪। পদসংখ্যা [২৪০৭]। ৫। পদসংখ্যা [২৪১৬]। ৬। পদসংখ্যা [২৪২০]। ৭। পদসংখ্যা [৫৩১, ৫৩৮] ; শেষের পদটীতে সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণের পদকল্পতরুতে "প্রাক আদিত" এই পাঠ ধরা আছে। তাহা সমীচীন নহে।

বিদ্যাপতি, রায়-সন্তোষ, হরিনারায়ণ, নরসিংহ ও রূপনারায়ণ সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। এখন রায়-বসন্ত ও রায়-চম্পতি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

অনেকে বলেন যে, এই রায়-বসন্ত, ভবানন্দ (রায়) মজুমদারের পুত্র এবং তথাকথিত বসন্ত-সুকুমার কাব্যের রচয়িতা ; এবং ইনি অনুমান ৮৪০ সালে ভুরসুট পরগণায় জন্মগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য যে, এই অনুমানের সমর্থক বিন্দুমাত্রও প্রমাণ পাওয়া যায় না ; উপরন্তু রায়-বসন্তের পদ আলোচনা করিলে, তিনি যে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী কবি, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। অপরে বলেন যে, ইনি প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য ছিলেন। ইহাও গল্প মাত্র। পদকল্পতরুতে (পরিষৎ সংস্করণ) [৫৩৮] সংখ্যক পদের ভণিতা এইরূপ মুদ্রিত হইয়াছে,—

জানহ পুন পুন সো পিয়া পরিখন সোই পূজে পাঁচ-বাণ।
প্রাত আদিত ও রস-গাহক দাস-গোবিন্দ ভাণ॥

অনেকের মতে, প্রাত আদিত=প্রতাপাদিত্য। কিন্তু ভাষাতত্ত্বের দিক্ হইতে তাহা ঠিক নহে। এই স্থলে পুথিতে পাঠ আছে,—

রায়-চম্পতি ও রস-গাহক দাস-গোবিন্দ ভাণ॥

এবং এই পাঠই শুদ্ধ বলিয়া মনে হয়।

পদকল্পতরুতে রায়-বসন্তের উনত্রিশটী পদ আছে। সেগুলির পদসংখ্যা এই,— [২৪৫৩, ২৪৪৯, ২৯২৬, ২৪৪৬, ২৪৪৮, ২৯২৯, ২৯২৭, ২৯৩৫, ২৯১৮, ২৯০৫, ২৯২৩, ২৯৩৪, ৫৫২, ২৯৩৩, ২৯২৪, ২৯২১, ২৯৪৭, ২০৩২, ২৯৩১, ২৯২৮, ২৪৫০, ২৪৫১, ২৯২০, ২৯১৭, ২৪৫২, ২৪৪৭, ২৯৩০, ২৯১৯, ২৯৫৪]। (রায়-বসন্তের কিছু পরিচয় অগ্রে দিয়াছি। এক সময়ে নরোত্তম ঠাকুর, রামচন্দ্র কবিরাজ, গোবিন্দ-কবিরাজ ও ব্যাস চক্রবর্ত্তীর মধ্যে তর্ক উঠে, গোস্বামি-সম্মত মত কোন্‌টী—স্বকীয়া-বাদ, না পরকীয়া-বাদ ? নরোত্তম ঠাকুর ও কবিরাজ-ভ্রাতৃদ্বয় পরকীয়া-বাদের পক্ষে, আর ব্যাস চক্রবর্ত্তী স্বকীয়া-বাদের পক্ষে ছিলেন। এই সংশয় নিরাস করিবার জন্য নরোত্তম ঠাকুর ও কবিরাজ-ভ্রাতৃদ্বয় বৃন্দাবনে শ্রীজীব গোস্বামীর মত জানিতে ইচ্ছুক হইয়া পত্র লিখিলেন। এই পত্র রায়-বসন্তের মারফতে পাঠান হইল। শ্রীজীব গোস্বামীও রায়-বসন্তের গৌড়দেশে ফিরিবার সময় তাঁহার হাত দিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্যকে পত্র পাঠাইয়া দেন।)

শ্রীজীব গোসাঞির স্থানে পত্রী করিয়া লিখন।
পাঠাইব পত্র দঢাইলাম তিন জন॥
গোস্বামি-পার্ষদবর্গে এক লিখন।
মনে বিচারি ইহা লঞা যাবে কোন জন॥
রায় বসন্ত নামে এক মহাভাগবত।
বৃন্দাবন যাবার লাগি চিন্তে অবিরত॥
আমরা কহিল তারে যত বিবরণ।
তার দ্বারে পত্রী মোরা দিলুঁ তিন জন॥
তার পর রায় যবে আইল গৌড়দেশে।
পত্রী পাইয়া আমাদের বাড়িল সন্তোষে॥ [কর্ণানন্দ, পঞ্চম নির্য্যাস]।

রায়-বসন্ত নরোত্তম ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। তাঁহার একটী পদ ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত আছে। সেটী এই,—

প্রভু নরোত্তম গুণনিধি।

কনক-কমল জিনি সুকোমল তনুখানি
না জানি গড়িল কোন বিধি॥
গোরা প্রেমে মত্ত হৈয়া রাজ্যভোগ তেয়াগিয়া
পরম আনন্দ বৃন্দাবনে।
পাইয়া অমূল্যধন কৈলা আত্মসমর্পণ
প্রভু লোকনাথের চরণে॥
কৃপা করি লোকনাথ করিলেন আত্মসাৎ
হইল গমন গৌড়-দেশে।
শ্রীগৌড়-ভ্রমণ করি গিয়া নীলাচলপুরী
পুনঃ গৌড়ে করিলা প্রবেশে॥
প্রভু-পরিকর যত অনুগ্রহ কৈল কত
কি অদ্ভুত গীত প্রকাশিলা।
এ দাস বসন্ত ভণে পাষণ্ডী-অসুরগণে
করুণা করিয়া উদ্ধারিলা॥ [ভক্তিরত্নাকর, প্রথম তরঙ্গ]॥

গোবিন্দদাসের পদের মধ্যে এই দুইটী ভণিতায় রায়-চম্পতির উল্লেখ দেখা যায়। দুইটী পদ একই ছন্দে লেখা।—

বিরহ-মোচন এ তুয়া লোচন-কোণে হেরবি কাম।
রায়-চম্পতি বচন মানহ দাস-গোবিন্দ ভাণ॥ [৫৩১]॥
জানহ পুন পুন সো পিয়া পরিখন সোই পূজে পাঁচবাণ।
রায়-চম্প'তি১ ও রস-গাহক দাস-গোবিন্দ ভাণ॥ [৫৩৮]॥

পদকল্পতরুর মধ্যে রায়-চম্পতি ভণিতাযুক্ত পদ একটী [২০২৫], বিদ্যাপতি-কবি-চম্পতি-ভণিতাযুক্ত পদ একটী [৩৬৮], এবং শুধু চম্পতি-ভণিতাযুক্ত পদ আটটী পাওয়া যায় [৪৮০, ১৭৪৪, ১৬৬৪, ৭২৫, ১৬৫৮, ৪৮২, ৪৮১, ৫৩২]। এই চম্পতি কে? শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ পটুত্বের সহিত সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন যে, ইনি এবং বিদ্যাপতি অভিন্ন। ইহা অশ্রদ্ধেয়। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য এ সম্বন্ধে একেবারে নীরব; কেবল রাধামোহন ঠাকুর একটু ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি পদামৃতসমুদ্রের টীকার দুই স্থলে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন যে, চম্পতি-রায় দাক্ষিণাত্যবাসী, শ্রীগৌরচন্দ্রের ভক্ত, এবং মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহাপাত্র ছিলেন এবং তিনিই গীতকর্ত্তা।

"শ্রীগৌরচন্দ্রভক্তঃ শ্রীপ্রতাপরুদ্রমহারাজস্য মহাপাত্রঃ চম্পতি-রায়নামা মহাভাগবত আসীৎ স এব গীতকর্ত্তা" (পদামৃতসমুদ্র, পৃঃ ১৭৪)।

১। পাঠান্তর—'প্রাত আদিত' (প-ক-ত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৬০)।

"চম্পতি-রায়নামা দাক্ষিণাত্যঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যভক্তরাজঃ কশ্চিদাসীৎ স এব গীতকর্ত্তা" (ঐ পৃঃ ২৯২)।

চম্পতিরায়ের এই পরিচয় (যে তিনি চৈতন্যদেবের পার্ষদমণ্ডলীভুক্ত ছিলেন) সত্য হইলে, ইহা আমাদের বুঝিতে হইবে যে, গোবিন্দদাস বিদ্যাপতির পদের মত রায়-চম্পতিরও কতকগুলি পদ পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। উড়িষ্যায় যে ব্রজবুলি বিস্তার লাভ করিয়াছিল, তাহা রায় রামানন্দের "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গি ভেল" পদ হইতে প্রমাণিত হয়।

'চম্পতি' শব্দ 'চমূপতি' শব্দ হইতে আসিয়াছে; অর্থ—সেনাপতি। ইহা নামও হইতে পারে, পদবীও হইতে পারে। এই স্থলে বলিয়া রাখা ভাল যে, বঙ্গদেশে প্রচলিত পদবী 'চম্পটী'র সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই; 'চম্পটী' বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের উপাধি, গাঞি নাম, এবং ইহা আসিয়াছে গ্রামের নাম হইতে—প্রাচীন হিন্দু আমলের তাম্রশাসনে এই গ্রামের নাম 'চম্পাহিট্টী'রূপে পাওয়া যায়।

পদ্যাবলীতে শ্রীরূপগোস্বামী দক্ষিণদেশবাসী কোন কবির রচিত ("দাক্ষিণাত্যস্য") বলিয়া পাঁচটী শ্লোক তুলিয়াছেন [শ্লোকসংখ্যা ৮, ৫০, ৭০, ১১৫, ২৮২]। তাহার মধ্যে একটী শ্লোকে 'চমূপতি' কথাটী আছে; এবং সেই স্থলে ঐ কথাটী কবির নাম বলিয়া ধরিয়া লইলে বেশ সঙ্গত অর্থ হয়। সে শ্লোকটী এই,—

["অথ ভজনবাৎসল্যম্।

অতন্দ্রিতচমূপতিপ্রহিতহস্তমস্বীকৃত-
প্রণীতমণিপাদুকং কিমিতি বিস্মৃতাস্তঃপুরম্।
অবাহনপরিচ্ছদং পতগরাজমারোহতঃ
কবিপ্রকরবৃংহিতে ভগবতস্ত্বরায়ৈ নমঃ॥ ১॥ ৫০॥ দাক্ষিণাত্যস্য"]।

এই চমূপতিই কি পদকর্ত্তা চম্পতি?

'ভূপতি', 'কবি ভূপতি', 'সিংহ ভূপতি' এবং 'নৃপতি সিংহ কবি'—এই ভণিতার সর্ব্বসমেত চৌদ্দটী পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় [৪৮৩, ৪৭৯, ১৮৭৮, ৪৭৮, ৫৩৯, ১৭২৬; ৪৮৮; ১৬৯৮, ১০৮০, ৪৭৭, ১৭৩৬, ১৯৮৩, ১১৪; ৪৮৩]। অনেক পুথিতে এই সকল পদের কোন কোনটীর ভণিতায় ভূপতির পরিবর্ত্তে চম্পতি নাম পাওয়া যায় (পদকল্পতরুর পাঠান্তর দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি ১০৬০-১০৬৩ সালের মধ্যে লেখা একখানি পদসংগ্রহ-গ্রন্থ আমি দেখিতে পাইয়াছি। তাহাতে 'দুর্জ্জয় মান' প্রসঙ্গে পর পর সাতটী পদ আছে। সব পদগুলিতেই ভূপতির ভণিতা। এই পদগুলি পদকল্পতরুতেও পর পর দেওয়া আছে [৪৭৭-৪৮৩]। পদকল্পতরুতে কিন্তু এই সাতটীর মধ্যে তিনটী পদের ভণিতায় ভূপতির পরিবর্ত্তে চম্পতির ভণিতা পাওয়া যায়। যথা,—

পদকল্পতরু—পাঁচ পঞ্চগুণ দশগুণ চৌগুণ আট দ্বিগুণ সখি মাঝে।
চম্পতিপতি অতি আকুল তো বিনু বিষাদ না পায়সি লাজে॥ [৪৮০]॥

পুথি—পাঁচ ২ গুণ চৌগুণ (দশ) গুণ আট দ্বীগুণ সখি মাঝে।
ভূপতি (পতি) অতি তুয়া গুণে আকুল ইসব না পায়েবি লাজে॥ (পৃষ্ঠা ৬০)।

পদকল্পতরু—দশগুণ অধিক অনলে তনু দাহিল রতিচিহ্ন দেখি প্রতি-অঙ্গে।
চম্পতি পৈড়[১] কপূর যব না মিলব তব মীলব হরি সঙ্গে ॥ [৪৮১] ॥

পুথি—আনলুঁহুঁ[২] অধিক বোসে তনু জাবল রতিচিহ্ন দেখি প্রতি অঙ্গে।
ভূপতি কহে কর্পূর পেড় যব না মিলব তবহুঁ মিলব হরিসঙ্গে ॥ (পৃঃ ৬০) ।

পদকল্পতরু—মেরু-সম মান কোপ সুমেরু-সম দেখি ভেল বেণু সমান।
চম্পতিপতি অব বাই মানাইতে আপ সিধাবহ কান ॥ [৪৮২] ॥

পুথি—মেরু সম মান সুমেরু সম কোপ হাম ভেল বেণু সমান।
ভূপতিনাথ কহে বাধে যব মিলব আপে সিধাবহ কান ॥ (পৃঃ ৬১) ।

অতএব ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, চম্পতি আর ভূপতি সম্ভবতঃ একই ব্যক্তির উপাধি বা পদবী।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলার দশম পরিচ্ছেদে মূলস্কন্ধশাখা-বর্ণনার মধ্যে এক উড়িষ্যাবাসী সিংহেশ্বরের নাম আছে।—

রামভদ্রাচার্য্য আর ওড্র সিংহেশ্বর।
তপন-আচার্য্য আর রঘু নীলাম্বর ॥

এই 'সিংহেশ্বর'ই কি 'সিংহভূপতি' বা 'রায়-চম্পতি' ?

[৩]

কাব্য-পরিচয়

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবেই বাঙ্গলা বৈষ্ণব সাহিত্যের জন্ম হয়। সত্য বটে, চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি, এই দুই মহাকবি মহাপ্রভুর অনেক পূর্ব্বেই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, আমরা সাধারণতঃ চণ্ডীদাসের নামের যে সকল পদের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া চণ্ডীদাসকে মহাকবি বলিয়া সম্মান করিয়া থাকি, তাহার চৌদ্দ-আনা অংশ, হয় মহাপ্রভুর পশ্চাদনুবর্ত্তী বৈষ্ণব কবি বা কবিগণের রচনা, অথবা তাহা চণ্ডীদাসের প্রাচীন পদের বৈষ্ণব কবিকর্ত্তৃক সংস্কৃত রূপ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক রচনা। ঐ কাব্যের মূল রস, কামশাস্ত্রের বা সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের আদিরস, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পদ্ধতির প্রেমরস নহে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কৃষ্ণ প্রকট কামুক, রাধা প্রথমে লজ্জাশীলা কুলবালা ও পরে পরপুরুষানুরক্তা বিগতলজ্জা নারী। মোটামুটি ইহাই চণ্ডীদাসের প্রামাণিক কাব্যের নায়ক-নায়িকার পরিচয়।

১। পৈড়—ডাব (উড়িষ্যায় প্রচলিত শব্দ), কর্পূরসংযোগে ডাবের জল বিষ হইয়া উঠে, এই প্রবাদ উড়িষ্যায় এখনও প্রচলিত আছে। ভূপতি ওরফে চম্পতি যে দক্ষিণদেশের লোক ছিলেন, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করা যাইতে পারে।

২। আনলুহঁ—আনলহুঁ (অনল হইতে)।

বিদ্যাপতির সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। শ্রীচৈতন্যদেব বিদ্যাপতির (এবং চণ্ডীদাসের) কাব্য আস্বাদন করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতির কাব্যের স্থূল অর্থ যাহাই হউক না কেন, শ্রীচৈতন্যদেব কর্ত্তৃক তাহার আস্বাদন তাঁহার সমকালীন ও পরবর্ত্তী বৈষ্ণব মহাজন ও কবিগণকে ঐ কাব্যের মধ্যে অলৌকিক রসান্তরের আভাস বা উদ্দেশ দিয়া গিয়াছে; এবং ঐ অর্থেই বৈষ্ণব মহাজনেরা ঐ বাহ্যতঃ স্থূল আদিরসাত্মক পদগুলি পরম আনন্দে আস্বাদন করিয়া গিয়াছেন। আমরাও এখন পর্য্যন্ত সেই ধারা অনুসরণ করিয়া ঐ পদের আলোচনা ও রসাস্বাদন করিয়া থাকি। অধিকন্তু, চণ্ডীদাসের পদের মত বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত অনেকগুলি পদ যে পরবর্ত্তী বৈষ্ণব-কবিগণ কর্ত্তৃক রচিত বা সংস্কৃত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কিছু প্রমাণ দেওয়া গিয়াছে।

এইরূপ অবস্থায় চণ্ডীদাস (শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বাদে) ও বিদ্যাপতির পদাবলীকে বৈষ্ণব সাহিত্যের বহির্ভুক্ত করা চলে কি? বৈষ্ণব মহাজন-রসিকদিগের অনুমত ভাব পরিত্যাগ করিয়া কেবল মৈথিল ভাষানুযায়ী ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে বিদ্যাপতির কবিত্বের খ্যাতি আমাদের দেশে যথেষ্ট কমিয়া যাইবে।

শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিরা রাধা ও কৃষ্ণকে লইয়া গান বাঁধিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরবর্ত্তী কবিরাও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। তবে এই দুই সাহিত্যের মূলগত পার্থক্য কি, এবং সেই পার্থক্যের কারণই বা কি—এই প্রশ্ন সহজেই উঠিতে পারে। প্রাক্-চৈতন্য ও অর্ব্বাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব-সাহিত্যের[১] পার্থক্য ও তাহার কারণ মূলতঃ এই।

(ক) পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে রাধা সামান্য নায়িকা মাত্র, পরবর্ত্তী সাহিত্যে রাধার প্রাধান্য কৃষ্ণের প্রাধান্যকেও ছাড়াইয়া গিয়াছে।

(খ) প্রাক্-চৈতন্য সাহিত্যে কৃষ্ণ ঈশ্বর, বিষ্ণুর অবতার; তাঁহার সকল দাবী ঈশ্বরত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরবর্ত্তী সাহিত্যে কৃষ্ণ পরমপুরুষ, 'সর্ব্বকারণকারণম্'; আর তাঁহার দাবী নয়—প্রার্থনা—শিশুত্বের, বাল্যের, সখ্যের, প্রেমের মধ্য দিয়া। রাধাকৃষ্ণের লীলা সাধারণ প্রেমিক-প্রেমিকার বিলাসমাত্র না হইয়া জীবশক্তি ও চিৎশক্তির চিরন্তনী লীলার প্রতীক হইয়া দাঁড়াইল। সাধক ও ভক্ত এই লীলার সাক্ষী হইয়া আনন্দ অনুভব করেন। সিদ্ধ হইলে তিনি এই অনাদি অনন্ত লীলার সহায়ক সখী হইয়া যান, এবং লীলার পুষ্টি সাধন করেন।

(গ) শ্রীচৈতন্যদেবের অপূর্ব্ব চরিত্রই বৈষ্ণব-সাহিত্যের মেরুদণ্ড। বৈষ্ণব-কবিরা অনেকেই আজীবন কুমার ছিলেন; তাঁহারা স্বীয় প্রেয়সীর মুখচ্ছবি ও আচরণের আদর্শে রাধার বর্ণনা ও চরিত্র-অঙ্কন করেন নাই; তাঁহারা রাধাভাবের মূর্ত্তিকে চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়া রাধাকে গড়িয়া গিয়াছেন। এই বিষয়েই এতটুকুমাত্রও কল্পনার আবশ্যক হয় নাই। শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে শেষ দ্বাদশবর্ষের আচরণ তাঁহারা শুধু রাধার উপর আরোপ করিয়া দিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে মহাপ্রভুর আবির্ভাব না হইলে, বাঙ্গালার যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ্ বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্য, তাহার সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। বাঙ্গলার বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও সাহিত্য

১। প্রকৃতপক্ষে প্রাক্-চৈতন্য রাধাকৃষ্ণ সাহিত্যকে (জয়দেব-চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতি) বৈষ্ণব সাহিত্য বলা চলে না। এই সাহিত্যে রাধা ও কৃষ্ণ মোটামুটি নায়ক ও নায়িকার প্রথাগত (conventional) নাম মাত্র। অবশ্য কৃষ্ণকে সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

অন্বেন্দু-সম্বন্ধে স্থাপিত ; এবং এই ধর্ম্ম কোন দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত মত, বা বিশেষ কোনও তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া উদ্ভূত হয় নাই। এই ধর্ম্ম এক অপূর্ব্ব জীবনকে অবলম্বন করিয়া বিচিত্রভাবে বিকসিত হইয়া উঠিয়াছে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে উচ্চশ্রেণীর কবির সংখ্যা সুপ্রচুর। প্রধান প্রধান কবিদিগের নাম করিতে গেলে—বাসুদেব ঘোষ, মুরারি গুপ্ত, রামানন্দ বসু, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, গোবিন্দদাস কবিরাজ, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, নরোত্তম ঠাকুর, যদুনন্দনদাস, নরহরিদাস (ঘনশ্যাম) ইত্যাদি। এই সকল প্রথমশ্রেণীর কবির মধ্যে গোবিন্দদাস-কবিরাজের স্থান সর্ব্বোচ্চে। গোবিন্দদাস-কবিরাজ-রচিত পদের সংখ্যা চারি শতের উপর। এই পদগুলি সবই ব্রজবুলী ভাষায় রচিত। গোবিন্দদাস কবিরাজ বাঙ্গালায় কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। পদামৃতসমুদ্রে উদ্ধৃত গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে যে যে পদগুলিকে রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাস-কবিরাজ মহাশয়ের রচনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেগুলির কোনটিই বাঙ্গালা পদ নহে। বাঙ্গলা পদগুলি প্রায়ই গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া রাধামোহন উল্লেখ করিয়াছেন। অধিকন্তু, বাঙ্গালা পদগুলি ব্রজবুলী পদগুলির তুলনায় নিকৃষ্ট। অতএব স্বচ্ছন্দে বলা যায় যে গোবিন্দদাস-কবিরাজ মহাশয় সম্ভবতঃ বাঙ্গালায় পদরচনা করেন নাই।

বৈষ্ণব-সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় খুবই সঙ্কীর্ণ। সকল পদকর্ত্তাই শুধু এই দুইটী বিষয় অবলম্বন করিয়াই কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন,—শ্রীচৈতন্যের বন্দনা এবং লীলা-প্রসঙ্গ, আর রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বর্ণনা। বৈষ্ণব-কবিদের পরম আশ্চর্য্যজনক কৃতিত্ব এই যে, তাঁহারা এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে আপনাদিগের কবিত্বশক্তি, স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্বের যথেষ্ট পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দদাস-কবিরাজ অভিসার, উৎকণ্ঠা ও ভাবোল্লাস বর্ণনায় অতুলনীয়। এমন কি, অভিসার বিষয়ে গোবিন্দদাসের কৃতিত্ব সংস্কৃত-সাহিত্যের সুপ্রসিদ্ধ কবিগণের কৃতিত্বকে পরাজিত করিতে পারে। কবিরাজ কৃষ্ণলীলার প্রায় সকল বিষয়েই অত্যুৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছেন, কেবল বাৎসল্য-ঘটিত পদ তাঁহার নাই বলিলেই হয়। গোষ্ঠলীলার সম্বন্ধে দুই একটী পদ আছে, কিন্তু অন্যান্য পদের অপেক্ষা সেগুলি কিছু নিকৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

গোবিন্দদাসের নিজকৃত একখানি পদাবলী ছিল। তাহার নাম "গীতামৃত" ছিল কি না, বলা সুকঠিন। রাধামোহন ঠাকুর গোবিন্দদাস-কবিরাজকৃত পদাবলী গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন বলিয়া পদামৃতসমুদ্রের টীকায় লিখিয়াছেন ; কারণ—'চম্পকসোনকুসুমকনকাচল' ইত্যাদি পদের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"তৎকৃতে গ্রন্থেহস্য দাক্ষিণাত্য শ্রীরাগো দৃশ্যতে, কিন্তু পূর্ব্বাপরং গৌরীরাগেন গানং শ্রুতমতো গৌরীরাগো লিখিতঃ" যাহা হউক, সে পুঁথি এখন প্রচলিত নাই। বর্ত্তমানে কবিরাজের পদগুলি পদামৃতসমুদ্র, পদকল্পতরু, পদরসসার প্রভৃতি সংগ্রহ-গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত আছে। কবি পদগুলি পারম্পর্য্যক্রমে রচনা করিয়াছিলেন কি না, উপস্থিত জানিবার উপায় নাই।

এখন গোবিন্দদাস-কবিরাজ মহাশয়ের পদগুলির পারম্পর্য্য অনুসারে ধারাবাহিক

ভাবে পরিচয় দেওয়া যাউক। বলা বাহুল্য, যে নিম্নের আলোচনায় সকল পদগুলিরই আলোচনা করা সম্ভবপর হয় নাই।)

রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন।—তাঁহার রূপ অঞ্জনকে গঞ্জনা দেয়, জলদপুঞ্জকে পরাজিত করে এবং জগতের লোকের নয়ন পরিতৃপ্ত করে। তাঁহার শীতলচরণ নবারুণ ও কমলদলের ন্যায় রক্তিম, তাহা শরতের অরবিন্দকে সৌন্দর্য্যে পরাভূত করিয়াছে। তাঁহার গ্রীবা হইতে লম্বিত ভ্রমরগণ-চুম্বিত কেলিকদম্বের মালা অবনি চুম্বন করিতেছে। তরুণ তমালের মত এই পুরুষের অধরসুধাময় যে মুরলীধ্বনি তরঙ্গিণীবৎ উছলিয়া পড়িতেছে তাহাতে রঙ্গিণী গোপীদের হৃদয়রূপ বসন বিগলিত হইয়াছিতেছে। মত্ত ভ্রমরের ন্যায় তাঁহার লোল লোচন কর্ণপ্রান্ত-বিলম্বিত উৎপলের দিকে ধাবিত হইতেছে। কপালে তাঁহার সুন্দর তিলক। চূড়ায় শিখিপুচ্ছ, তাহাকে রমণীদিগের মন মধুকর-মালার ন্যায় বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে।

অঞ্জন-গঞ্জন জগ-জন-রঞ্জন জলদ-পুঞ্জ জিনি বরণা।
তরুণারুণ-থল-কমল-দলারুণ মঞ্জির-রঞ্জিত-চরণা॥ [২৪১২]॥[১]
তনু-তনু-অনুলেপন ঘন-চন্দন-মৃগমদ-কুঙ্কুমপঙ্ক।
অলিকুলচুম্বিত অবনিবিলম্বিত বনি-বনমাল-বিটঙ্ক॥
অতি-সুকুমার-চরণতল-শীতল জীতল শরদরবিন্দ।
(রায়-সন্তোষ-মধুপ-অনুসন্ধিত নন্দিত-দাস-গোবিন্দ॥)[২৪১৫]॥
অধর-সুধা-ঝর মুরলি-তরঙ্গিণি বিগলিত-রঙ্গিণি-হৃদয়-দুকূল।
মাতল-নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি উড়ি পড়ত শ্রুতি-উতপল-ফুল॥
রোচন তিলক চুড়ে বনি চন্দ্রক বেঢল রমণি-মন-মধুকর-মাল।
গোবিন্দদাসচিতে নিতি নিতি বিহরই ইহ নাগরবর তরুণ-তমাল॥
[২৪২৪]॥

কৃষ্ণকে দেখিয়া অবধি রাধার মনের শান্তি একেবারে বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতেছেন। মেঘ দেখিলে কৃষ্ণের স্মৃতি হইতেছে, চক্ষুতে জল ভরিয়া আসিতেছে। রাধা বিজনে তরুণ তমালকে আলিঙ্গন করিতেছেন [৩৯]।

রাধা সম্পূর্ণরূপে শ্যামময় হইয়া গিয়াছেন। চক্ষে তাঁহার শ্যামকজ্জল, মুখে তাঁহার শ্যাম-নাম, অঙ্গে তাঁহার শ্যাম শাটী। শ্যাম তাঁহার বক্ষের হার, হৃদয়ের মণি। শ্যামবর্ণা সখীকে তিনি আলিঙ্গন করিতেছেন। শ্যাম তাঁহার মর্ম্মে লাগিয়াছে। পরিজন নিঠুর। রাধার মুখ ম্লান পদ্মের মত দেখিতে হইয়াছে। অবিরল অশ্রুধারায় কজ্জল ধুইয়া যাইতেছে। নয়নে ঘুম নাই।

১। [ ] বন্ধনী-মধ্যস্থ সংখ্যাগুলি পদকল্পতরুর পদসংখ্যা সূচিত করিতেছে।

লোচনে শ্যামর বচনহি শ্যামর শ্যামর চারু নিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়ে মণি শ্যামর শ্যামর-সখি কর কোর॥
ঐছনহি শ্যামর পরিজন পামর ঝামর মুখ-অরবিন্দ।
ঝর-ঝর লোরহি লোলিত কাজর বিগলিত লোচননিন্দ॥

বাসনা উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে। রাত্রি শেষ হইয়া আসিল। কৃষ্ণ কি ভুলিয়া আছেন? কবি গোবিন্দদাস আর কতক্ষণ রাধাকে আশ্বাস দিয়া রাখিবেন?

মনমথ সাগর রজনি উজাগর নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস কতহুঁ আশোয়াসব মিলবহুঁ নন্দকিশোর॥ [৪০]॥

কৃষ্ণও রাধাকে দৃগ্‌গোচর করিয়াছেন। রাধার লাবণ্যের তো বর্ণনা হয় না। তাঁহার মুখশ্রী শরৎকালীন চন্দ্রমণ্ডলের শোভাকে পরাজিত করিয়াছে। তাঁহার অধরে মৃদুহাস্য উঠিয়াই মিলাইয়া যাইতেছে। কবরীতে বকুলফুলের মালা বেষ্টন করিয়া আছে, তাহাতে আকুল অলিকুল মধুপানে মত্ত হইয়া ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। রাধার সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ঝলমল করিতেছে, এবং বাহুর কঙ্কণ ও কটির কিঙ্কিণি মৃদু মৃদু শিঞ্জিত হইতেছে। পদপঙ্কজের উপর মণিময় নূপুর ঝঙ্কৃত হইতেছে। রাধার পদনখ কামদেবের দর্পণস্বরূপ; কবি গোবিন্দদাস তাহার বালাই লইতেছেন।

শরদসুধাকরমণ্ডলমণ্ডনখণ্ডন বদনবিকাশ।
অধরে মিলায়ত শ্যামমনোহরচিতচোরায়নি হাস॥
আজু নব শ্যামবিনোদিনি রাই।
তনু-তনু অতনুযূথশতসেবিত লাবণি বরণি না যাই॥ ধ্রু॥
কবরি-বকুলফুলে আকুল অলিকুল মধু পিবি পিবি উতরোল।
সকল অলঙ্কৃতি কঙ্কণ-ঝঙ্কৃতি কিঙ্কিণি রণরণি বোল॥
পদপঙ্কজ পর মণিময় নূপুর রণঝণ খঞ্জন-ভাষ।
মদনমুকুর জনু নখমণিদরপণ নীছনি গোবিন্দদাস॥ [২৪৬৩]॥

বস্ত্রের ভিতর হইতে রাধার অঙ্গদ্যুতি ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় আভাসিত হইতেছে। রাধা থামিয়া থামিয়া চলিতেছেন, আর তাঁহার প্রতি পদক্ষেপে যেন একটী একটী করিয়া স্থলপদ্ম ফুটিয়া উঠিতেছে। সখীদিগের সহিত রাধা কথা কহিতেছেন, তাহাতে তাঁহার ভ্রূভঙ্গীতে যেন যমুনার তরঙ্গ হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছে। রাধার তরল-নয়নের দৃষ্টি যেখানে যেখানে পড়িতেছে সেখানে সেখানে নীলপদ্মের বন ভরিয়া উঠিতেছে। রাধার হাস্যে কুন্দ ও কুমুদ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছে। রাধার এই অপূর্ব্ব শ্রীতে মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণ তাঁহাকে যেন চিনিয়াও চিনিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

যাহাঁ যাহাঁ নিকসয়ে তনু-তনু-জ্যোতি।
তাহাঁ তাহাঁ বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাহাঁ যাহাঁ অরুণ-চরণ চল চলই।
তাহাঁ তাহাঁ থল-কমল-দল খলই॥

দেখ সখি কো ধনি সহচরি মেলি।
হামারি জীবন সঞে করতহি খেলি॥
যাহাঁ যাহাঁ ভঙুর ভাঙ-বিলোল।
তাহাঁ তাহাঁ উছলই কালিন্দি-হিলোল॥
যাহাঁ যাহাঁ তরল বিলোচন পড়ই।
তাহাঁ তাহাঁ নীল উতপল বন ভরই॥
যাহাঁ যাহাঁ হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাহাঁ তাহাঁ কুন্দ-কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ যুগধল কান।
চিনলহু রাই চিনই নাহি জান॥ [৮৬]॥

কবি এই পদটী বিদ্যাপতির নিম্নোদ্ধৃত সুপরিচিত পদের ভাব লইয়া লিখিয়াছেন।—

জহাঁ জহাঁ পদ-জুগ ধরই। তঁহি তঁহি সরোরুহ ভরই॥
জহাঁ জহাঁ ঝলকত অঙ্গ। তহিঁ তহিঁ বিজুরি তরঙ্গ॥
জহাঁ জহাঁ নয়ন বিকাস। তহিঁ তহিঁ কমল প্রকাস॥
জহাঁ জহাঁ কুটিল কটাখ। ততহিঁ মদনসর লাখ॥

এই স্থলে গোবিন্দদাস বিদ্যাপতিকে অনুকরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নিজের শক্তিমত্তার যথেষ্ট পরিচয়ও ঐ পদটীর মধ্যে যে দিয়া গিয়াছেন তাহা পদ দুইটী তুলনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে।

রাধার অনুরাগ গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। আর বুঝি সখীগণের নিকট হইতে গোপন রাখা যায় না। প্রস্ফুটিত কদম্ব দেখিলে রাধার দীর্ঘনিশ্বাস স্বতঃই ফুলিয়া উঠে। অঙ্গে সর্ব্বদা পুলকোদ্গম হইতেছে। করতলে বদন রাখিয়া রাধা সর্ব্বদাই চিন্তামগ্ন। চোখের জল অতি কষ্টে নিবারণ করিতে হয়। কথাও ভাল করিয়া কহিতে পারেন না। তুচ্ছ ছল করিয়া রাধা একবার ঘর আর একবার বাহির করিতেছেন। ইহা হইতে সখী আন্দাজ করিয়াছে, যে রাধা শ্যামচন্দ্রকে দেখিয়াছেন।

নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদন সঘন অবলম্ব॥
খেনে তনু মোড়সি করি কত ভঙ্গ।
অবিরল-পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গ॥
এ ধনি মোহে না করু আন ছন্দ।
জানলু ভেটলি শ্যামর-চন্দ॥
ভাব কি গোপসি গুপত না রহই।
মরমক বেদন বদন সব কহই॥
যতনে নিবারসি নয়নক লোর।
গদগদ শবদে কহসি আধ বোল॥

আনছলে অঙ্গন আনছলে পন্থ।
সঘনে গতাগতি করসি একন্ত ॥ [৭

রাধা যখন দেখিলেন যে সখীর নিকট আর মনোভাব গোপন রাখা চলে না, তখন স্বীকার করিলেন, যে তিনি পথে যাইতে কৃষ্ণকে দেখিয়াছেন। আর সেই হইতেই তাঁহার এই অবস্থা।

সজনি যাইতে পেখলুঁ কান।
তব ধরি জগ ভরি ভরল কুসুম-শর নয়নে না হেরিয়ে আন ॥
মঝু মুখ দরশি বিহসি তনু মোড়ই বিগলিত মোহন-বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল কিশলয়দলে কর দংশ ॥
অতয়ে সে মরুমন জ্বলতহি অনুখন দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস মিছই আশোয়াসল অবহুঁ না মীলল কান ॥—[৭৩] ॥

রাধাকে আশ্বাস দিবার জন্য সখী কৃষ্ণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেছেন। রাধা নিষেধ করিলেন। রাধা কৃষ্ণকে এখনও ভাল করিয়া দেখেন নাই, কিন্তু তাহাতেই প্রাণ থাকে কি যায়, তাহার স্থিরতা নাই। ধন্য সেই রমণী, যিনি কৃষ্ণকে দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াও বাঁচিয়া থাকিতে পারেন। কৃষ্ণকে সখী ঘনশ্যাম বলে, কিন্তু রাধার নয়ন তাহ তো বিদ্যুতের ন্যায় ঝলসাইয়া দেয়। প্রেমিকা না কি প্রেমের জন্য জীবন ত্যাগ করিতে পারে। রাধার কিন্তু এখনও চপল জীবনে সাধ আছে। অতএব কৃষ্ণের কথা উত্থাপন না করাই ভাল।

আধক আধ আধ-দিঠি-অঞ্চলে যব ধরি পেখলুঁ কান।
কত শত কোটি কুসুমশরে জর জর রহত কি যাত পরাণ ॥
সজনি জানলুঁ বিহি মোহে বাম।
দুহুঁ লোচন ভরি যে হরি হেরই তছু পায়ে মঝু পরণাম ॥
সুনয়নি কহত কানু ঘনশ্যামর মোহে বিজুরি সম লাগি।
রসবতি তাক পরশরসে ভাসত হামারি হৃদয়ে জনু আগি ॥
প্রেমবতি প্রেম লাগি জিউ তেজত চপল জিবনে মঝু সাধ।
গোবিন্দদাস ভণে শ্রীবল্লভ জানে রসবতি-রস-পরিবাদ ॥—[২৩৪] ॥

রাধা সহচরীগণের সহিত কালিন্দীতে স্নান করিতে চলিয়াছেন। দিবাকর-কিরণে ম্লান কাঞ্চন শিরীষকুসুমের ন্যায় তাঁহার মূর্তি কৃষ্ণের চিত্ত চুরি করিয়া লইল। রাধা চঞ্চল নয়ন-কোণে কৃষ্ণকে কটাক্ষ করিয়া মন চুরি করিবার সুনিপুণ প্রণালী দেখাইলেন। যমুনার বেলাভূমি উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে রাধা কোমল চরণ অতি ধীরে ধীরে বিক্ষেপ করিয়া চলিতেছেন। রাধার কষ্ট দর্শনে কৃষ্ণের নয়ন সজল হইল। রাধা সেই সজল নয়নপঙ্কজ দুইটী পাদুকা করিয়া লইলেন। নয়ন মন দুইই হারাইয়া কৃষ্ণ একেবারে রিক্ত হইয়া পড়িলেন।

সহচরি মেলি চললি বররঙ্গিণি কালিন্দি করই সিনান।
কাঞ্চন শিরিষ-কুসুম জনু তনুরুচি দিনকর-কিরণে মৈলান ॥

সজনি সো ধনি চীতক চোর।
চোরিক পন্থ ভোরি দরশায়লি চঞ্চল নয়নক ওর॥
কোমল চরণ চলত অতি মন্থর উতপত বালুক-বেল।
হেরইতে হামারি সজল দিঠি-পঙ্কজ দুহুঁ পাদুক করি নেল॥
চীত নয়ন মঝু দুহুঁ সে চোরায়লি শূন হৃদয় অব মান।
মনমথ-পাপ-দহনে তনু জারত গোবিন্দদাস ভালে জান॥—[২০৪]॥

রাধা ও কৃষ্ণের পরস্পরের মিলনোৎকণ্ঠা দেখিয়া সখী তাঁহাদের মিলনসাধনে যত্নবতী হইলেন। রাধার নিকট দূতী কৃষ্ণের বিরহ-ব্যথার বর্ণনা করিতেছে। কৃষ্ণ রাধার বিরহে ক্ষীণতনু ও জর্জ্জরিত হইয়াছেন। চন্দ্রের কিরণ তাঁহার নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। অভিসারের আশায় তিনি রাগিণী মেঘমল্লার আলাপ করেন, তাহাতে আকাশে মেঘ আসে, কিন্তু তাঁহার উত্তপ্ত দীর্ঘনিঃশ্বাসে তাহা উড়িয়া যায়। ধবল বসনের ভারও তিনি সহ্য করিতে পারিতেছেন না। রাধার নিকট আসিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। রাধার নাম ও গুণগ্রাম জপিতে জপিতে তাঁহার অঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠে, এবং তাহা করিয়াই তিনি কোনও ক্রমে জীবনধারণ করিয়া আছেন।

চান্দ নিহারি চন্দনে তনু লেপই তাপ সহই না পার।
ধবল নিচোল বহই নাহি পারই কৈছে করব অভিসার॥
যতনহি মেঘমল্লার আলাপই তিমির-পয়ান গতি আশে।
আওত জলদ ততহিঁ উড়ি যাওত উতপত দীঘ নিশাসে॥
তুয়া গুণ-নাম-গাম জপি জীবই বহু পুলকয়িত দেহা।
গোবিন্দদাস কহ ইহ অপরূপ নহ যাহাঁ ইহ নব নব নেহা॥—[২১৮]।

কৃষ্ণ বেতসকুঞ্জ-গৃহে বসিয়া আছেন। তিনি একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন, এবং একবার পথ দেখিয়া আসিতেছেন। কৃষ্ণ রাধার নিবিড় বিরহ-দহনে দহিতেছেন। তাঁহাকে এখনও রাধার অবিশ্বাস করা উচিত হয় না।

কবহুঁ উঠত কবহুঁ বৈঠত পন্থ হেরত তোর।
অমল-কমল-নয়ন-যুগল সঘনে গলয়ে লোর॥
এতহুঁ যতনে পুরুষ-রতনে চিতে নাহি বিশোয়াস।
গহন-বিরহ দহনে দহই কহই গোবিন্দদাস॥-[২১৭]॥

কৃষ্ণের প্রাণ রক্ষার্থ রাধা অগত্যা চলিলেন। রাধা সর্ব্বাঙ্গ উত্তমরূপে বস্ত্রগুপ্ত করিয়া চতুর্দ্দিকে চকিতনয়নে চাহিতে চাহিতে চলিয়াছেন। ইহাতে সখী রহস্য করিয়া রাধাকে বলিতেছে,—তুমি বলিতেছ, যে আমার কথাতেই তুমি কৃষ্ণের নিকট যাইতেছ। তোমার এই কথার ছাঁদ আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমাদিগকে বঞ্চনা করিলে তোমার কি ফল হইবে? তোমার ব্যবহারে বুঝিতেছি যে, তুমি কৃষ্ণপ্রেম ধন অন্তরে সঞ্চিত করিয়া গোপনে চলিয়াছ। কিন্তু তোমার হাস্য, তোমার প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গী, তাহাই ব্যক্ত করিতেছে। এত দিনে স্বচক্ষে দেখিলাম, যে চোরের অঞ্চলের গ্রন্থিতে চুরিকরা ধন থাকিলে তাহার মুখ দেখিয়া তাহা ধরা যায়। আর তুমি এই গোপন-ধন লইয়া এতই আকুল হইয়াছ যে

পথও ভাল করিয়া নজর করিতেছ না।—রাধা উত্তর দিবার উপক্রম করিলে সখীস্থানীয় পদকর্ত্তা গোবিন্দদাস তাঁহাকে বলিতেছেন,—তুমি থাম, তোমার এতক্ষণ মৌনভাব হইতেই সব ব্যাপার বুঝিয়া লইয়াছি।

চৌদিক চকিত-নয়নে ঘন হেরসি ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
বচনক ভাতি বুঝই নাহি পারিয়ে কাঁহা শিখলি ইহ রঙ্গ॥
সুন্দরি কী ফল পরিজনে বাঁচি।
শ্যাম-সুনাগর-গুপত-প্রেমধন জানলুঁ হিয়া মাহা সাঁচি॥
এ তুয়া হাস নবম পরকাশই প্রতি-অঙ্গভঙ্গিম সাখী।
গাঁঠিক হেম বদন মাহা ঝলকই এতদিনে পেখলুঁ আঁখি॥*
গহন-মনোরথে পন্থ না হেরসি জীতলি মনমথবাজ।
গোবিন্দদাস কহই ধনি বিরমহ মৌনহিঁ সমুঝলুঁ কাজ॥—[২২৭]॥

রাধা কৃষ্ণের নিকট আসিলেন। চকিতা ও উৎকণ্ঠিতা রাধা সখীর আঁচল ধরিয়া কোনও প্রকারে পর্য্যঙ্কে বসা না-বসার মত করিয়া বসিলেন। সখী প্রস্থানোদ্যতা হইলে রাধাও উঠিতে চাহিলেন। রাধা দিয়া কৃষ্ণ রাধার হাত ধরিতে গেলে রাধা হাত ঠেলিয়া দিলেন। কৃষ্ণ রাধার মুখের প্রতি চাহিতে রাধার নয়নে জল ভরিয়া উঠিল। * * * রাধার এই অপরূপ লাবণ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্যের মধ্যে কৃষ্ণের বাসনা ডুবিয়া গেল।

ধরি সখি আঁচরে ভই উপচন্ক। বৈঠে না বৈঠয়ে হরি পরিযঙ্ক॥
চলইতে আলি চলই পুন চাহ। রস-অভিলাষে আগোরল নাহ॥
লুবুধল মাধব মুগধিনি নারী। ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি॥
পরশিতে তরসি করহি কর ঠেলই। হেরইতে বয়ন নয়নজল খলই॥
হঠ পরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ। চুম্বনে বদন পটাঞ্চলে ঝাঁপ॥
শূতলি ভীত-পুতলি সম গোরি। চীত-নলিনি হরি রহই আগোরি॥
গোবিন্দদাস কহই পরিণাম। রূপকে কূপে মগন ভেল কাম॥ [১০০]॥

রাধার লজ্জা ও সাধ্বস দেখিয়া সখী ভর্ৎসনা করিতেছে। যদি হরির পাণিস্পর্শে তুমি এতই কাঁপিবে এবং অঙ্গের সংবৃত্ত বসনকে আরও সংবরণ করিবে, তাহা হইলে তুমি এখানে আসিবার পূর্ব্বে অত বেশ প্রসাধনের রঙ্গ করিলে কেন? তুমি নিজের কার্য্য বুঝিতেছ না? যাহার বিরহে তুমি জাগিয়া ও ঘুমাইয়াও স্বস্তি পাও না, তাহাকে কি এত লজ্জা ও ভয় করিতে আছে?

যব হরি-পাণি-পরশে ঘন কাঁপসি ঝাঁপসি ঝাঁপল অঙ্গ।
তব কিয়ে ঘন ঘন মণিময়-অভরণ বেশ পসায়নি রঙ্গ॥
এ ধনি অবহুঁ না সমুঝসি কাজ।
যাহে বিনু জাগরে নিদহুঁ না জীবসি তাহে কিয়ে এত ভয় লাজ॥ (২৩৬)

এই রাধা ও মাধবের প্রথম মিলন এখনও পরিচয় হয় নাই। কৃষ্ণের অনুনয়ে রাধা

---

* তুলনীয় জ্ঞানদাস—আঁচরে কাঞ্চন ঝলকে মুখে।
মরমে পিরিত বেকত অঙ্গে॥[৬৭৩—]।

অবনতমুখে পদনখে মাটি খুঁটিতে লাগিলেন। কৃষ্ণ চঞ্চল হইয়া রাধার অঞ্চল স্পর্শ করিতে গেলেন, রাধা অমনি আধ পা পিছাইয়া গেলেন। বিদগ্ধ মাধব রাধার মন বুঝিয়া চরণ স্পর্শ করিতে হাত বাড়াইলেন। রাধা নিবারণ করিতে গেলে কৃষ্ণের হাতে তাঁহার হাত ঠেকিয়া গেল। পাণিস্পর্শে প্রেমের সঞ্চার হইল। রাধা ঈষৎ হাসিয়া অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন।

পহিলহি রাধা-মাধব মেলি। পরিচয় দুলহ দূরে বহু কেলি ॥
অনুনয় করইতে অবনত-বয়নী। চকিত-বিলোকনে নখে লিখু ধরণী ॥
অঞ্চল পরশিতে চঞ্চল কান। রাই করল পদ-আধ পয়ান ॥
বিদগধ নাগর অনুভব জানি। রাইক চরণে পসারল পাণি ॥
করে কর বারিতে উপজল প্রেম। দারিদ ঘট ভরি পাওল হেম ॥
হাসি দরশি মুখ আগোরলি গোরি। দেই রতন পুন লেয়লি চোরি ॥
ঐছন নিরুপম পহিল বিলাস। আনন্দে হেরত গোবিন্দদাস ॥— [৫২] ॥

বসন্তকাল, শুক্লপক্ষের রজনী, রাধা কৃষ্ণের অভিসারে চলিয়াছেন। রাধার কবরীতে কুন্দকুসুম, হৃদয়ে মুক্তার মালা, অঙ্গে কর্পূর ও চন্দনের বিলেপন, ধবল বস্ত্র পরিধান। এইরূপ শ্বেত বসন ভূষণে মণ্ডিতা রাধাকে উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণের মধ্য হইতে লক্ষ্য করা যায় না। গৃহের পরিজনের দৃষ্টি এইরূপে এড়াইয়া রাধা নিকুঞ্জে চলিয়াছেন।

কুন্দকুসুমে ভরু কবরিক ভার। হৃদয়ে বিরাজিত মোতিম-হার ॥
চন্দন-চরচিত রুচির কপূর। অঙ্গহি অঙ্গ অনঙ্গ ভরিপূর ॥
ধবল-বিভূষণ-অম্বর বনই। ধবলিম-কৌমুদি মিলি তনু চলই ॥
হেরইতে পরিজন-লোচন ভুল। রঙ্গপুতলি কিয়ে রসমাহ বুর ॥—[৩০৫] ॥

রাধা কৃষ্ণের অপেক্ষায় কুঞ্জগৃহে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণের বিলম্ব দেখিয়া সখী তাঁহার নিকট গিয়া বলিতেছেন।—মাধব, মন্মথ শিকারে ফিরিতেছে। রাধা তাহার লক্ষ্য। মদনের শরাঘাতে জরজর হইয়া রাধা একেলা নিকুঞ্জে রহিয়াছে। তুমি সত্বর যাইয়া তাহাকে বাঁচাও। বসন্তের রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল; অনেক দূর যাইতে হইবে। রাধা গলায় আশা-পাশ লইয়া প্রেমকল্পতরুর মূলে বসিয়া আছে। তাহার ফল অমৃত হইবে, কি গরল হইবে, তাহা তোমার যাওয়া না যাওয়ার উপর নির্ভর করিতেছে। (অর্থাৎ কৃষ্ণের সহিত মিলন হইলেই রাধার আশা-পাশ গলার মালা হইয়া দাঁড়াইবে, নতুবা তাহা গলার ফাঁস হইয়া তাহার প্রাণবিনাশেরই হেতু হইবে)।

মাধব মন্মথ ফিরত অহেরা।
একলি নিকুঞ্জে ধনি ফুলশরে জরজর পন্থ নেহারত তেরা ॥

* * * *

তুহু অতি মন্থর গমন দুরন্তর মধু-যামিনি অতি ছোটি।
সো ঘর বাহির করত নিরন্তর নিমিখ মানয়ে যুগ কোটি ॥
আশাপাশ লেই গলে বৈঠলি প্রেমকল্পতরু মূল।
কিয়ে অমিয়া কিয়ে গরব গরল ফল গোবিন্দদাস কহ ফুর ॥—[৩১৮] ॥

পৌষ মাসের রাত্রি, মন্দ মন্দ বায়ু বহিতেছে; তুষারে চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। গৃহে থাকিয়াও সকলে কাঁপিতেছে। সকল লোকই শয্যায় আপাদমস্তক আবৃত করিয়া শয়ন করিয়াছে। পরম বিস্ময়ের বিষয় যে, রাধা এমন সময়ে অভিসারে বাহির হইয়াছে। সুখময় শয্যা ত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্বেত-বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া সকলের অলক্ষিতে তিনি কুঞ্জে চলিয়াছেন। তুহিনের শীতস্পর্শ ও পথের কণ্টকাদির প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপ মাত্র নাই। কবি বলিতেছেন—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? নূতন প্রেমের নিকট কি কোন বাধা টিকিতে পারে?

পৌখলি রজনী পবন বহে মন্দ। চৌদিশে হিম হিমকর করু বন্ধ॥
মন্দিরে রহত সবহুঁ তনু কাঁপ। জগজন শয়নে নয়ন রহুঁ ঝাঁপ॥
পরিহরি তৈছন সুখময় শেজ। উচকুচকঞ্চুক ভরমহি তেজ॥
ধবলিম এক বসনে তনু গোই। চললিহ কুঞ্জে লখই নাহি কোই॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি সন্দেহ। কিয়ে বিঘিন যাহা নূতন নেহ॥—[৩২৬]॥

রাধা কুঞ্জে কৃষ্ণের অপেক্ষায় রহিয়াছেন, এ দিকে সখী আসিয়া কৃষ্ণকে নিবেদন করিতেছে।—শীতের রাত্রি, যমুনার তীরে কুঞ্জকুটীর-লতাগুলি শীতল পবনে আন্দোলিত হইতেছে। সেই তুষার-সমীরে কেহই স্থির থাকিতে পারে না। রাধা সেখানে আর কতক্ষণ একেলা কাটাইবেন? মাধব, তোমার প্রেম ধন্য; আর রাধাও ধন্য যে, কুলগৌরব-রূপ কঠিন কপাট উদ্ঘাটন করিয়া, গুরুজনদিগের সতর্ক নয়নরূপ কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া এইরূপ সময়ে তোমার সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছে।

হিম-ঋতু-যামিনী যামুন-তীর। তরল-লতা-কুল-কুঞ্জ-কুটীর॥
তহিঁ তনু থির নহে তুহিনসমীর। কৈছে রঙ্গব শুন শ্যামশরীর॥
ধনি তুহুঁ মাধব ধনি তুয়া নেহ। ধনি ধনি সো ধনি পরিহর গেহ॥
কুলবতি-গৌরব-কঠিন-কপাট। গুরুজন-নয়ন-সকণ্টক বাট॥
কো জানে এতহুঁ বিঘিনি অবগাই। ঐছন সময়ে মিলব তোহে রাই॥—[৩৩৭]॥

কুঞ্জে কৃষ্ণের অপেক্ষায় বহুক্ষণ থাকিয়া রাধা অধীর হইয়া সখীকে বলিতেছেন।—কতক্ষণ আমি আর দুর্জ্জন-নয়নরূপ প্রহরীকে বঞ্চনা করিয়া, প্রেমধন হৃদয়মধ্যে সঞ্চিত করিয়া রাখিব? পথ পানে চাহিয়া চাহিয়া নয়ন ধাঁধিয়া গেল। রজনী শেষ হইয়া আসিল; অনুরাগ তো বাড়িয়াই চলিয়াছে, কৃষ্ণ এখনও আসিলেন না। কবি বলিতেছেন,—আমার প্রভুর দিগ্‌ভ্রান্তি হইয়াছে।

কতহুঁ প্রেমধন হিয়-মাহা সাচি। দুরজন নয়ন-পহরি কত বাঁচি॥
পন্থ নেহারি নয়নযুগ লাগি। টুটত রজনী বাঢত অনুরাগী॥
অবহুঁ না মীলল শ্যামর-কাঁতি। গোবিন্দদাস-পহু দীগভর ভাতি॥—[৩৬২]॥

অন্যাসক্ত মনে করিয়া রাধা কৃষ্ণকে যথোচিত ভর্ৎসনা করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছেন; পরে অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন।—কুলবতী কেহ যেন পরপুরুষকে নয়নের কোণেও না দেখে; আর যদি দেখে তো কৃষ্ণকে যেন কিছুতেই না দেখে। কৃষ্ণকে যদি দেখিতেই হয়,

তবে যেন তাঁহার সহিত প্রেম না করে। আর যদি প্রেম করিয়া ফেলে, তবে যেন মানিনী না হয়।

কুলবতি কোই নয়নে জনি হেরই হেরত পুন জনি কান।
কানু হেরি জনি প্রেম বাঢ়াযই প্রেম করই জনি মান ॥—[৪৩৪] ॥

রাধার এই অনুতাপ শ্রবণ করিয়া সখী বলিতেছেন।—কৃষ্ণের মুরলীরব শুনিবার সময় আমি তোমার কর্ণদ্বয় রোধ করিয়াছিলাম; কৃষ্ণকে দেখিবার সময় আমি তোমার চক্ষু ঢাকা দিয়াছিলাম,—তুমি ভ্রমে পড়িয়া আমার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে। আমি তোমাকে তখনই বলিয়াছিলাম যে, তুমি ভুল করিয়া কৃষ্ণের সহিত প্রেম করিতেছ, ইহার ফলে তোমাকে কাঁদিয়া জন্ম কাটাইতে হইবে। গুণের পরিচয় না লইয়া কেন তুমি পরপুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে নিজের দেহ সমর্পণ করিলে? ইহার জন্য তুমি দিন দিন তোমার রূপলাবণ্য খোয়াইতেছ; তোমার এখন বাঁচাই সংশয়। শ্যাম (রূপ) মেঘের জল প্রত্যাশা করিয়া তুমি তোমার হৃদয়ে যে প্রেমতরু রোপণ করিয়াছ, কবি গোবিন্দদাস বলিতেছেন, সেই বৃক্ষে এখন তোমাকে নয়ননীর সেচন করিতে হইবে।

শুনইতে কানু-মুরলি-রব-মাধুরী শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলু তব মোহে রোখলি ভোর ॥
সুন্দরি তৈখনে কহলম তোয়।
ভরমহি তা সঞে লেহ বাঢ়াযলি জনম গোঁয়াযবি রোয় ॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপ-লালসে কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপ-লাবণি জীবইতে ভেল সন্দেহা ॥
যো তুহুঁ হৃদযে প্রেমতরু রোপলি শ্যাম-জলদ-রস-আশে।
সো অব নয়ন-নীর দেই সীচহ কহতহি গোবিন্দদাসে ॥—[৪৩৫] ॥

ইহার সহিত অমরুশতকের এই শ্লোকটীর মর্ম্মগত সাদৃশ্য আছে।—

অনালোচ্য প্রেম্ণঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বযা কান্তে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাক্লিষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাসুরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্ তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥

রাধা মানিনী হইয়াছেন। কৃষ্ণ অনেক সাধ্য-সাধনা করিলেন, রাধা কিছুতেই প্রসন্ন হইলেন না। কৃষ্ণ চলিয়া গেলে রাধার জ্ঞান হইল। তখন আর উপায় নাই; তিনি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিয়াছেন। এখন শুধু তিনি কৃষ্ণের দর্শনের কাঙ্গাল।

সো বহুবল্লভ সহজই দুর্লভ দরশন লাগি মন ঝুর।
(গোবিন্দদাস যব যতনে মিলায়ব তবহিঁ মনোরথ পূর ॥)—[৪৩৬] ॥

সখীও ভর্ৎসনা আরম্ভ করিলেন।—খল লোকের কথায় তুমি অবিচার করিয়া কৃষ্ণের প্রতি মান করিয়াছ। কৃষ্ণ রোষে বিমুখ হইয়া চলিয়া গিয়াছেন, এখন আর আমার মুখের দিকে কাতর হইয়া চাহিলে কি হইবে?

কহলম খলজন দোখল কান। তুহুঁ অবিচারে বাড়ায়সি মান॥
রোখে বিমুখ যব চললু বরনাহ। অব কাতরদিঠে মঝু মুখ চাহ॥—[৪৩৭]॥

বর্ষা কাল, রাধা অভিসারে বাহির হইয়াছেন। আকাশে নূতন মেঘ ঘনঘটা করিয়া আসিয়াছে। গৃহের বাহিরে অন্ধকার এমন নিবিড় যে, নিজ দেহও দেখা যায় না। বাধার অন্ধকারে কিছু আসিয়া যায় না, তাঁহার অন্তরে শ্যামচন্দ্র উদিত হইয়াছে, তাহাতে প্রেমসিন্ধু উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে। এই তো প্রথম অভিসারের উপযুক্ত লগ্ন। সখীদিগের আর বিচার করা উচিত নয়। তাহারা রাধার অঙ্গে মৃগমদ লেপন করিয়া নীলবসন পরাইয়া দিল। কাঁচুলির আবশ্যক কি? সে তো অনাবশ্যক ভারমাত্র। মুক্তার হার সপত্নীতুল্য, অতএব পরিত্যাজ্য। এক সখী দ্বারদেশ হইতে দেখিয়া আসুক, গুরুজনসকল জাগিয়া আছে, কি ঘুমাইতেছে। পথে যাহাতে দিক্‌ভ্রম না হয়, সেই জন্য সখীস্থানীয় কবি গোবিন্দ-দাস গোপনে সঙ্গে চলিলেন।

অম্বরে ডম্বর ভরু নব মেহ। বাহিরে তিমিরে না হেরি নিজ দেহ॥
অন্তরে উয়ল শ্যামর ইন্দু। উছলল মনহিঁ মনোভবসিন্ধু॥
অব জনি সজনী করহ বিচার। শুভখন ভেল পহিল অভিসার॥
মৃগমদে তনু অনুলেপহ মোর। তহিঁ পহিরায়হ নীল নিচোল॥
কী ফল উচকুচকঞ্চুক ভার। দূর কর সৌতিনি মোতিম হার॥
তুহুঁ সখি দেখহ দেহলি লাগি। গুরুজন অবহুঁ ঘুমল কিয়ে জাগি॥
চলইতে দীগভরম জনি হোয়। গোবিন্দদাস সঙ্গে চলু গোয়॥—[৩৪২]॥

রাধা কুঞ্জগৃহে বসিয়া আছেন। কৃষ্ণের আসিতে কিছু দেরী হইয়াছে, সেই জন্য রাধা মান করিয়া কৃষ্ণকে উপেক্ষা করিলেন। সখী কৃষ্ণের হইয়া রাধাকে বলিতেছে।—তুমি গরবিনী হইয়া বাসগৃহে রহিয়াছ, ওদিকে কৃষ্ণ শ্রাবণ-মেঘের বর্ষণ মাথায় করিয়া আসিল। তুমি সুখময় পর্য্যঙ্কে শুইয়া আছ; আর কৃষ্ণ প্রান্তর্‌ পঙ্ক উত্তীর্ণ হইয়া তোমার কাছে আসিয়াছে। সখী, অস্থানে মান করিও না, তোমার বহুপুণ্যের ফলে তুমি রসিকশেখর কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে পারিয়াছ। এখন রাত্রি ঘোর হইয়াছে, বিজলী চমকাইতেছে। এমন সময়ে কামিনী কি কান্তের ক্রোড় ত্যাগ করিতে পারে? আকাশের মধ্যে ঘন ঘন মেঘ ডাকিয়া উঠিতেছে; কোন রমণী এমন সময়ে নাথকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে?

তুহুঁ রহ গরবিনী বাসক গেহ। সো ভিগি আওল শাঙন মেহ॥
তুহুঁ শূতলি সুখময় পরিযঙ্ক। সো তরি আওল পাঁতর পঙ্ক॥
এ ধনি দূর কর অসময় মান। পুনফলে মীলল রসময় কান॥
ঝলকত দামিনি যামিনি ঘোর। কামিনি কি তেজই কান্তক কোর॥
ঘন ঘন-গরজন অম্বর মাহ। বরজত কোনে এ হেন বর-নাহ॥—[৫৪৮]॥

প্রার্থনা-চাটুকার কৃষ্ণ রাধাকে বলিতেছেন।—মন্মথ-মকরের ত্রাসে আমার মানস-মৎস্য তোমার হার-তটিনীর তীরস্থ কুচকুম্ভে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। এ আমার অতীব দুর্দৈব যে, তুমি সেই কলসীর মৎস্যকে বড়শী-বিদ্ধ করিতে চাহিতেছ।

ঘর্মঘর্ঘরকর-উরহি উরকাতর মঝু মানস-মৃগ কাঁপ।
তুয়া হিয়ে হারতটিনি-তট-কুচতট উছলি পড়ল দেই ঝাঁপ ॥
সুন্দরি সম্বর কুটিল কটাখ।
কলসিক মীন বড়সি কিয়ে ডারসি এ অতি কঠিন বিপাক।—[৬২৩] ॥

বৃন্দাবনের বনে মদন-কিরাতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে। তাহার দারুণ কুসুম-শর সহ্য করিতে না পারিয়া কৃষ্ণ পুরুষোচিত গৌরব ও লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া রাধার শরণাপন্ন হইলেন। ফলে বিপরীত হইল। মদন-কিরাতকে দমন করিবার জন্য প্রযুক্ত রাধার চঞ্চল নয়নবাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া কৃষ্ণের মর্ম্মে আঘাত করিল। এখন রাধা ও মদন, এই উভয়ের শরে বিদ্ধ হইয়া কৃষ্ণের জীবন সংশয়ারূঢ় হইয়া পড়িয়াছে। এখন কবি উপদেশ দিতেছেন,—

মণিময়-হার-তরঙ্গিণি-তীরহি কুচ-কনকাচলছায়।
ঐছে তপত জনে গোপতে রাখবি তব গোবিন্দদাস যশ গায়।—[২য় খণ্ড, পৃঃ ৭]

লীলাচুর্ল্লিত বহুবল্লভ কৃষ্ণকে রাধা আপনার প্রেমপাশে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়াছেন দেখিয়া সখী রাধাকে কৌতুকচ্ছলে বলিতেছেন।—তুমি তো কম নহ।—

যো গিরি-গোচর-বিপিনহি সঞ্চরু কৃশকটি কর অবগাহ।
চন্দ্রক-চারু-শটা-পরিমণ্ডিত অরুণ-কুটিল-দিঠি চাহ ॥
সুন্দরি ভালে তুহুঁ হরিণি-নয়ানি।
সো চঞ্চল-হরি হিয়া-পিঞ্জর ভরি কৈছনে ধরলি সয়ানি ॥—[৭০৬] ৷

এই পদটী কৃষ্ণ ও সিংহপক্ষে দ্ব্যর্থ। [হরি—(১) কৃষ্ণ, (২) সিংহ; কৃশকটি—(১) পুরুষোচিত সৌন্দর্য্য, (২) সিংহের বিশেষত্ব, ইত্যাদি]।

রাধা বলিতেছেন।—আমার রূপে বা গুণে কৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়াছেন, এ কথা ভুল। আমার যাহা কিছু সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য, তাহা কৃষ্ণেরই দান। তাঁহার প্রেমই আমাকে মর্য্যাদা দিয়াছে। কৃষ্ণ দক্ষ স্বর্ণকার; বেণুর নিঃস্বনে তিনি আমার হৃদয়ে প্রেমাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছেন; আমার কুলমর্য্যাদা সেই প্রেমাগ্নির ইন্ধন হইয়াছে। তাঁহার দৃষ্টি ও হস্ত উভয়ের স্পর্শই সোহাগা, ধর্ম্মজলই জুড়িবার (পান দিবার) বারি। এই উপায়ে তিনি আমার মনরূপ স্বর্ণে নিজ প্রেমরূপ মণি খচিত করিয়া এই অমূল্য হার গড়িয়া আমাকে পরাইয়া দিয়াছেন। সেই হারের পালিশ হইয়াছে নবানুরাগ। সেই মণিহার আমি গুরুজননয়নরূপ তস্করের নিকট হইতে লক্ষ প্রাণের মত গোপন করিয়া রাখিয়াছি।

বেণুক ফুকে বুকে মদনানল কুল-ইন্ধন যাহা জারি
দরশ পাণি দুহুঁ পরশে সোহাগল শ্রম-জল জোবণ বারি ॥
সজনি, কানু সে ছৈল সোণার।
মঝু মন-কাঞ্চন আপন প্রেম-মণি জোরি পিন্ধায়ল হার ॥
নব-অনুরাগ-রঙ্গে পুন রঞ্জল মূল না জানয়ে কোই।
গুরুজননয়নচৌর পরে ছাপিয়ে প্রাণ-লাখ সম গোই ॥—[৭০৭]।

প্রেমের আনন্দ প্রাপ্তির সুখের অপেক্ষা অনেক গভীর। কৃষ্ণের আলিঙ্গনে ধরা দিয়াও রাধার ভ্রান্তি রহিয়া গেল যে, কৃষ্ণকে তিনি পান নাই। প্রেম এইরূপই বিচারমূঢ়।

কোরহি শ্যাম চমকি ধনি বোলত কব মোহে মীলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহি মঝু মীটব অমিয়া করব সিনান॥
সো মুখ-মাধুরি বঙ্ক নেহারবই সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস-পরশ যব পাওব তবহিঁ মনোরথ পূর॥—[১৬৫]॥

মিলনের নিবিড় সুখ রাধার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ হইয়াছে। লোচনে পলক ও আনন্দের অশ্রু রাধাকে কৃষ্ণের বদন ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিতে দেয় না। একে ত গুরুজনের সতর্ক-দৃষ্টির জন্য কৃষ্ণকে দেখিবার সুযোগ তো ঘটিয়াই উঠে না।

সজনি অব হাম না বুঝি বিধান।
অতিশয় আনন্দে বিঘিন ঘটাওল হেরইতে ঝরয়ে নয়ান॥
দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরষে এ দুহুঁ দিঠি পূরল কৈছে হেরব মুখ চাই॥
তাহে গুরু-দুরুজন-লোচন-কণ্টক-সঙ্কট কতহুঁ বিথার।
কুলবতি বাদ-বিবাদ করত কত ধৈরজ-লাজ-বিচার॥

তুলনা করুন,— অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥—[মেঘদূত]॥

অতএব রাধা ঠিক করিলেন,—

সবহুঁ উপেখি যাই বন পৈঠব কানু গীমে করি হার।
নিরজনে রাতি-দিবস সুখে হেরব এহি দঢায়লুঁ সার॥—[১১৯]॥

রাধার বিপদ্ হইয়াছে, কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গীণ মাধুর্য্য কৃষ্ণকে সর্ব্বদাই রাধার মনে জাগরূক করিয়া রাখিয়াছে। কৃষ্ণের নবনব-গুণসমূহ কর্ণকে পরিতৃপ্ত করে, তাঁহার রূপ নয়নের রসায়ন স্বরূপ; তাঁহার মিলনকালীন সম্ভাষণ হৃদয়কে আপ্যায়িত করে, তাঁহার সঙ্গ স্পর্শকে অমৃতসিক্ত করিয়া দেয়।[১] সখি, যাঁহার অন্তর রসময়, এমন গুণগণসাগর শ্যাম সুনাগরকে কোন্ রমণী ভুলিতে পারে? সত্য বটে, গুরুজন আমাকে তর্জ্জন করে, কুলবতীরা আমাকে গালি দেয়; কিন্তু মধুর মুরলীর মধুর আশ্বাসে আমি এই সকল কষ্ট একেবারে ভুলিয়া যাই। কুলমর্য্যাদা লইয়া আমি কি করিব? তাহা তো দিবাদীপ-তুল্য বিড়ম্বনা মাত্র, প্রেম-পবনে নির্ব্বাপিতপ্রায়।

নব নব গুণগণ শ্রবণ-রসায়ন নয়ন-রসায়ন অঙ্গ।
রভস-সম্ভাষণ হৃদয়-রসায়ন পরশ-রসায়ন সঙ্গ॥

১। কবি অন্যত্রও বলিয়াছেন,—

রূপে ভরল দিঠি সোঙরি পরশ মিঠি পুলক না তেজই অঙ্গ।
মধুর-মুরলী-রবে শ্রুতি পরিপূরিত না শুনে আন পরসঙ্গ॥—[১৯৪]॥